আমরাই সরকার

বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ

লোক সভা
রাজ্য সভা
বিধান পরিষদ
বিধান সভা
জিলা পরিষদ
আঞ্চলিক পরিষদ
ন্যায় পনচায়ৎ
গ্রাম পনচায়ৎ

আমরাই সরকার

আমরাই সরকার

বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ
১৬ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত ১০ই 'মার্চ' ১৯৬৮

স্বীকৃতি ঃ

'সাক্ষরতা নিকেতন', লক্ষ্ণৌ, উত্তরপ্রদেশ হইতে সর্বপ্রথম হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত ; বর্তমান পুস্তকটি মূল হিন্দী হইতে অনুবাদাকারে প্রকাশ করিবার অনুমতি ও আর্থিক সহায়তা করিয়াছেন 'সাক্ষরতা নিকেতন' লক্ষ্ণৌ-৫।

বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ,
১।৬, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯
হইতে সত্যেন মৈত্র কর্তৃক প্রকাশিত।

আই. এন. এ. প্রেস,
১৭৩, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
হইতে মুদ্রিত।

মূল্য ঃ এক টাকা পঁচিশ পয়সা

নিবেদন

আমাদের দেশে নব-শিক্ষিত ও স্বল্প-শিক্ষিতদের এক অতি বৃহৎ সংখ্যা বর্তমান। লক্ষ্ণৌর ‘সাক্ষরতা নিকেতন’ তাঁদের জন্য অনেক বই প্রকাশ করেছেন—এই সব বই তাঁদের পরিবেশকে জানতে ও বুঝতে সাহায্য করবে, তাঁদের কর্তব্য, দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন করবে।

বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ থেকে তাঁদের কিছু বই আমরা হিন্দি থেকে বাংলায় অনুবাদ করব বলে ঠিক করেছি। ‘আমরাই সরকার’ তারই অন্যতম। হিন্দি-ভাষীদের মধ্যে এই বইটি অতিশয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে ও ভারত সরকারের শিক্ষা-বিভাগ থেকে এই বইটি পুরস্কার লাভ করেছে।

এই বইটি প্রকাশের অনুমতি ও সাহায্য দানের জন্য আমরা ‘সাক্ষরতা নিকেতনে’র কাছে কৃতজ্ঞ। শ্রীসীমন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বইটির অনুবাদ করেছেন।

সত্যেন মৈত্র

সম্পাদক, বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ

বিষয় সূচী

আমরাই সরকার
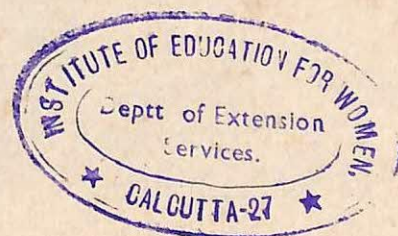
১৫ই অগাস্ট, ১৯৪৭ সাল—এই তারিখটা ভুলবার নয়। এই তারিখ চিরকাল মনে থাকবে। কারণ এদিন আমি আর আপনি, আমরা সকলেই এ দেশের সরকার হয়েছি। এখন দেশের শাসন আমাদের পাঁচজনের পরামর্শে চলবে। পনচায়েতি শাসন চালু হয়েছে এদেশে ১৯৫৬ সনে। আমরাই এখন ঠিক করব পনচায়েতে আমাদের তরফে কে কাজ করবে।

একটা কথা অবশ্যই বোঝা সহজ। আমাদের সকলের পক্ষে নিজের কাজকর্ম ছেড়ে শাসন চালানো

মত দান
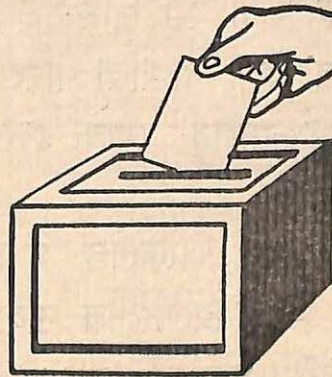
বা সরকার চালানোর কাজে সামিল হওয়া সম্ভব নয়। তাই আমরা নির্বাচন করি। নির্বাচন করি একজন প্রতিনিধিকে। প্রতিনিধি মানে এমন একজন লোক যাঁকে আমি বিশ্বাস করি। যিনি আমার হয়ে কাজ করবেন।

আমি আমার নিজের প্রতিনিধি দাঁড় করাই। ব্যালট বাক্সে আমার ভোটটি ফেলে তাঁকে নির্বাচন করি। তিনিই আমার তরফে এখন পনচায়েতে যাবেন। পনচায়েতে কাজ করবেন।

গ্রাম-সভা আর গ্রাম-পনচায়েত

কোন গ্রামের বাসিন্দা এমন সকল স্ত্রী-পুরুষের পুরো জমায়েতকে বলা হয় গ্রাম-সভা। কিন্তু যাঁদের বয়স ২১ বছরের কম, বা যাঁরা পাগল, যাঁরা ভারতের নাগরিক নন, গ্রাম-সভায় যোগ দেওয়ার অধিকার তাঁদের নেই।

গ্রাম-সভা এখন নিজেদের মধ্যে থেকে কিছু লোককে নিয়ে কাজ চালানোর জন্য একটা কমিটি করেন। এই কমিটির প্রত্যেক মেম্বর বা সদস্যকে নির্বাচন করা হয়। এই কমিটিকে বলা হয় গ্রাম-পনচায়েত।

গ্রাম-পনচায়েত হল দেশের সরকারের পয়লা ধাপ। একটি গ্রাম-পনচায়েতে গ্রামের জনসংখ্যার

ওপরে যে কটি কাজের বিষয় বলা হল তার সব কিছুই গ্রাম-সভা করে থাকে।

গ্রাম-পনচায়েতের কাজ

গ্রাম-পনচায়েতের কাজ দু প্রকার হয়ঃ

১। সেই সব কাজ যা গ্রাম-পনচায়েতের করা বিশেষ জরুরী। এদের অনিবার্য কাজ বলা হয়।

২। সেই সব কাজ যা গ্রাম-পনচায়েতের করা বা না করা তার আপন ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। এগুলিকে ঐচ্ছিক কাজ বলে।

অনিবার্য কাজ

গ্রামের সড়ক, গলি, সাঁকো ইত্যাদি সাফ করা আর সেখানে বাতি জ্বালার ব্যবস্থা করা; কলেরা, বসন্ত, প্লেগ ইত্যাদি মহামারী রোধের ব্যবস্থা করা; শ্মশান-মশান আর কবর খানার দেখা শোনা, সেগুলি ঠিকমত বজায় রাখা। কুঁয়ো, জলাশয় আর পুকুর খোঁড়া, তাদের সংস্কার করা, দেখাশোনা করা। খেত-খামার, আর জমি-জেরেতের উন্নয়নের

কাজে গ্রামবাসীকে সহায়তা করা। বাজার হাটের ব্যবস্থা করা ; পশু গণনা আর মানুষ গণনার হিসাব বহি রাখা।

ঐচ্ছিক কাজ

ময়লা খানা ডোবা ভরাট করা, উঁচু নিচু জমি বরাবর করা। পুস্তকালয় আর পাঠগৃহ খোলা। খেলাধূলা আমোদ-প্রমোদের জন্য আখড়া বা আসর তৈরী করা। রেডিও, গ্রামোফোন নিয়ে আসা। সকল রাস্তার ধারে ধারে গাছ লাগানো, কিষাণদের জন্য ভাল বীজ আর সারের জোগাড় রাখা। গ্রামে চাষের উপযোগী জমি বাড়ানো। আকাল, অজন্মা এইসব দুর্দিনে গ্রামবাসীদের সহায়তা করা।

এইভাবে আমরা দেখতে পাই, গ্রাম পনচায়েতের ভিতর দিয়ে গ্রাম সভা কি ভাবে গ্রামের উন্নতি আর সুবন্দোবস্তের কাজ করে থাকেন।

গ্রাম-পনচায়েতের কোন সদস্য পনচায়েতের বৈঠকে কোন প্রস্তাব বা কোন আপত্তি তুলতে পারেন। সভাপতির কাছে তিনি কোন সওয়াল জিজ্ঞাসা করতে পারেন। পনচায়েতে যে প্রস্তাব বেশী মত পায় অর্থাৎ বেশী সদস্যদের ভোট পায় সেইটিই মেনে নেওয়া হয়।

অনুপাতে ১০ থেকে ২০ জন সদস্য হতে পারে। পনচায়েতর একজন অধ্যক্ষ আর একজন উপ-অধ্যক্ষ থাকবেন। আমাদের পশ্চিম বাংলায় প্রায় কুড়ি হাজারের কিছু বেশী গ্রাম-সভা আছে। আর সেই সংখ্যক গ্রাম-পনচায়েত আছে। দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে পনচায়েতের ধাঁচ মোটামুটি একই ধরনের।

গ্রাম-পনচায়েত নির্বাচনের পদ্ধতি

গ্রাম-সভার এলাকার মধ্যে যাঁরা বাস করেন এবং বিধান সভার ভোটারের তালিকায় যাঁদের নাম আছে তাঁরা সবাই গ্রাম-সভার সদস্য। এঁদের একটা তালিকা গ্রাম-সভায় রাখা হয়। যাঁদের নাম সদস্য তালিকায় আছে তাঁরাই কেবল গ্রাম-পনচায়েতের সদস্যদের নির্বাচন করে থাকেন। গ্রাম পনচায়েতের সদস্যদের নির্বাচন করা হয় গোপনে ভোট দেওয়ার কায়দায়। পনচায়েত এই ভাবে গঠন করা হলে, পনচায়েত নিজেদের ভেতর থেকে একজন অধ্যক্ষ ও উপ-অধ্যক্ষ নির্বাচন করেন। অধ্যক্ষ আর গ্রাম-পনচায়েতের সদস্যদের চার বছরের

জন্য নির্বাচন করা হয়। উপ-অধ্যক্ষকে মাত্র চার বছরের জন্য নির্বাচন করা হয়।

গ্রাম-সভা আর গ্রাম-পনচায়েত কি কাজ করে ?

গ্রাম-সভার প্রতি বছরে কমপক্ষে ছমাস অন্তর দুবার বৈঠক হয়। বৈঠকে গ্রাম-পনচায়েত গ্রাম-সভার সামনে আগামী সনের আয় ব্যয়ের একটা হিসাব—যাকে বলা হয় বাজেট—তাই পেশ করেন। গ্রাম-সভা সেই বাজেটটি বিচার করে দেখেন। তারপর তা পাশ করেন। পরের বৈঠকে গ্রাম-পনচায়েত গত বছরের আয় আর ব্যয়ের একটা হিসাব দাখিল করেন। সারা বছর যে যে কাজ করা হয়েছে তার বিবরণ পড়ে শোনানো হয়। গ্রাম-সভা এই শুনানীর ওপর বিচার বিবেচনা করেন, তারপর সেটি পাশ করেন। এই বৈঠকে গ্রাম-সভা আরও কয়েকটা কাজ করেন। পনচায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে দরকার হলে অনাস্থা প্রস্তাব—অর্থাৎ তাঁর ওপর গ্রাম-সভা বিশ্বাস হারিয়েছে এই রায় এনে তাঁকে হটানো যেতে পারে।

অঞ্চল-পনচায়েত

আট থেকে দশটি পাশাপাশি পনচায়েত নিয়ে এক একটি অঞ্চল পনচায়েত তৈরী হয়। গ্রাম পনচায়েতের সভ্যরা নিজ এলাকার গ্রাম-সভার সদস্যদের মধ্য থেকে ২।৩ জন করে অঞ্চল-পনচায়েতের সদস্য নির্বাচন করেন। প্রতি ২৫০ জন গ্রাম-সভার সদস্য পিছু একজন করে অঞ্চল-পনচায়েতের সদস্য হন। গ্রাম আর অঞ্চল-পনচায়েতের সকল নির্বাচনই গোপন ব্যালটে ভোট নেওয়ার কায়দায় হয়।

অঞ্চল পনচায়েত কি করেন

অঞ্চল পনচায়েতের তিনটি প্রধান কাজ ঃ

১। এলাকার অধিবাসীদের উপর ট্যাক্স বসানো আর তা আদায় করা।

২। এলাকায় চৌকিদার ও দফাদার ব্যবস্থা করা।

৩। এলাকায় একটি করে ন্যায়-পনচায়েত সৃষ্টি করা।

অঞ্চল পনচায়েতের মারফৎ একদিকে গ্রাম পনচায়েত অন্য দিকে সরকারের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা হয়।

খরচের টাকা কোথা থেকে আসে

গ্রাম পনচায়েতের ওপর অনেক কাজের ভার পড়ে। সেইসব কাজ হাসিল করতে হলে তার পয়সার দরকার হয়। পনচায়েতের পয়সা কয়েক ভাবে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। যাঁরা সুদে টাকা খাটান, তাঁদের লগ্‌নী প্রতি টাকায় পনচায়েত বছরে ৬ পয়সা হারে কর ধার্য করতে পারে। কখনো কখনো গ্রামে সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রা ইত্যাদির দেখানোর দল আসেন। এদের উপর দৈনিক বেশীপক্ষে ৫ টাকা অবধি কর আদায় করা যেতে পারে। যদি গ্রাম সভার এলাকায় পশুর মেলা বা পশুর হাট বসে তা হলে পনচায়েত পশুর কেনা-বেচার রেজিস্টারী করতে পারেন ও তার জন্য ফী আদায় করতে পারেন। এলাকার মধ্যে হাট্ বাজার বা মেলায় দোকানদারদের ওপর কর ধার্য করতে পারেন।

উপরের নানা বিষয়গুলি ছাড়াও গ্রাম পনচায়েত সরকারের কাছ থেকে ঋণ বা সহায়তা হিসেবে আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকেন।

ন্যায় পনচায়েত

এক একটি ন্যায় পনচায়েতে ৫জন সদস্য হতে পারেন। এদের বিচারক বলা হয়। অঞ্চল পনচায়েতের সভ্যরা ন্যায় পনচায়েতের বিচারকদের নির্বাচিত করেন।

ন্যায় পনচায়েতের সদস্য সংশ্লিষ্ট গ্রাম সভার সভ্যদের ভিতর থেকে নেওয়া হয়। ন্যায় পনচায়েতের বিচারকেরা নিজেদের মধ্য থেকে একজন প্রধান বিচারক নির্বাচিত করেন। ন্যায় পনচায়েতকে ছোট ছোট দেওয়ানী ও
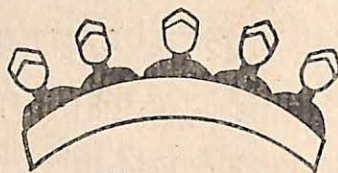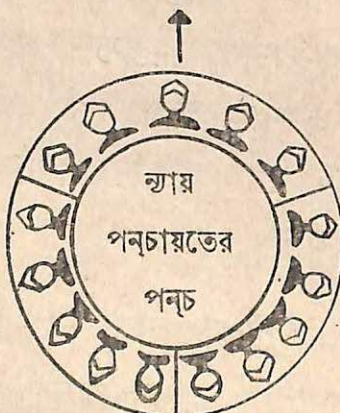
ফৌজদারী মামলা বিচার করবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। ন্যায় পনচায়েতের সদস্যদের নির্বাচন সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ।

আঞ্চলিক পরিষদ

প্রতি ব্লকে একটি করে আঞ্চলিক পরিষদ থাকে। যেমন গ্রামের উন্নতি আর বিকাশের জন্য পন্‌চায়েত কাজ করে তেমনি ব্লকের উন্নতি আর বিকাশের জন্য আঞ্চলিক পরিষদ কাজ করে। আঞ্চলিক পরিষদ আর জিলা পরিষদ আইন ১৯৬৩ সালে পশ্চিম বাংলায় পাশ হয়েছে।

আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য

ব্লকের অধীন সকল অঞ্চল পরিষদের প্রধান কিংবা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, প্রত্যেক অঞ্চল পনচায়েত এলাকা থেকে একজন নির্বাচিত অধ্যক্ষ, লোকসভা আর বিধান সভায় নির্বাচিত সদস্য যাঁদের নির্বাচন-কেন্দ্র ওই ব্লকে, রাজ্যসভা আর বিধান পরিষদের সদস্য যাঁরা ওই ব্লকের বাসিন্দা,—এঁরা সকলেই আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য হতে পারেন। এই সকল সদস্য ছাড়াও আরও দুজন সরকার মনোনীত

মহিলা এবং দুজন অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এবং আঞ্চলিক পরিষদের সভ্যদ্বারা সহযোগী দুজন সমাজ
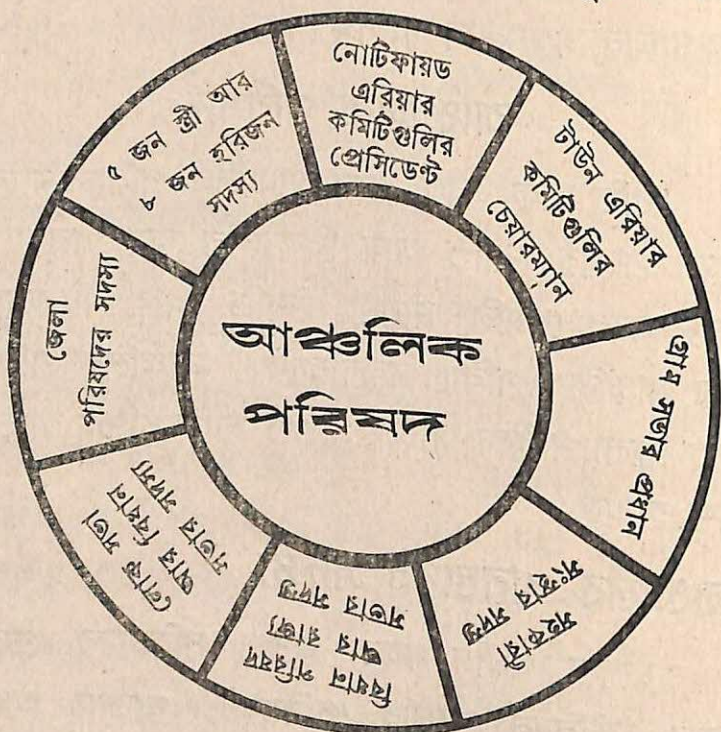
কল্যাণ ও পল্লী উন্নয়ন কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য আধিকারিক এবং সহযোগী সভ্য। এঁর কোন ভোটাধিকার নেই।

আঞ্চলিক পরিষদের সংশোধিত সদস্য ছাড়া অন্যান্য সকল সদস্য মিলে নিজেদের মধ্য থেকে একজন

প্রেসিডেণ্ট আর একজন ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করেন। বিধান সভার ভোটার তালিকায় যাঁর নাম আছে তিনিই প্রসিডেণ্ট পদের প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াতে পারেন। প্রেসিডেণ্ট আর ভাইস্-প্রেসিডেণ্টই আঞ্চলিক পরিষদের সদস্যদের মধ্যে থেকে নির্বাচন করা হয়ে থাকে। উভয় পদের জন্য প্রার্থীর ৩0 বছর বয়স হওয়া আবশ্যক। লোকসভা, বিধান সভা, রাজ্যসভা, বিধান পরিষদের সদস্য, টাউন এরিয়ার চেয়ারম্যান আর নোটিফায়েড এরিয়ার প্রেসিডেন্ট, প্রমুখ আর উপ-প্রমুখ পদের জন্য দাঁড়াতে পারেন না। আঞ্চলিক পরিষদ ৫ বছর অবধি কাজ করতে পারে।

আঞ্চলিক পরিষদের কাজ

আঞ্চলিক পরিষদের বিশেষ বিশেষ কাজ হল ঃ সহযোগিতার উন্নতি করা, জলসেচের জন্য পুকুর, নালা বাঁধ ইত্যাদি বানানো ; জানোয়ারদের হাসপাতাল খোলা ; পানীয় জলের ব্যবস্থা করা ; প্রাথমিক শিক্ষার দেখাশোনা করা ; অঞ্চল পনচায়েতগুলিকে অর্থ সাহায্য করা ; পথঘাট, পুল ইত্যাদি তৈরী করা। কুটীর, হস্তশিল্প খাদির উন্নতি করা আর ঔষধালয়

খোলা। এই সকল কাজকর্ম ছাড়াও সময় সময় সরকারের ভার দেওয়া কিছু কিছু কাজও আঞ্চলিক পরিষদকে করতে হয়। আঞ্চলিক পরিষদ নিজস্ব উন্নয়নের পরিকল্পনা রচনা করে আর অঞ্চল পনচায়ত-গুলিকেও উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনায় সাহায্য করে। আঞ্চলিক পরিষদ যথাসম্ভব অঞ্চল ও গ্রাম পনচায়েতের মাধ্যমেই উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করবার চেষ্টা করবে।

আঞ্চলিক পরিষদের মধ্যে কতকগুলি সমিতি থাকে যথা,—

(ক) অর্থ ও সংস্থা কমিটি।
(খ) জন স্বাস্থ্য কমিটি।
(গ) বাস্তু কমিটি।
(ঘ) কৃষি ও সেচ কমিটি।
(ঙ) শিল্প ও সমবায় কমিটি।
(চ) জন কল্যাণ ও সমাজ কল্যাণ কমিটি।
(ছ) প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি।
(জ) সরকারের অনুমোদন বা নির্দেশ অনুসারে অন্য যে কোন কমিটি।

জেলা পরিষদ

যেমন গ্রামের উন্নতি আর বিকাশ করেন গ্রাম পনচায়েত আর ব্লকের উন্নতি করেন আঞ্চলিক পরিষদ তেমনি জেলার উন্নতি বিধান করে থাকেন জেলা পরিষদ।

জেলা পরিষদের সদস্য

জেলার সকল আঞ্চলিক পরিষদগুলির সভাপতি জেলার প্রতি মহকুমা থেকে দু'জন করে নির্বাচিত সদস্য, জেলার কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সভার সদস্যগণ, জেলার মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানদের মধ্যে একজন, জেলা স্কুল বোর্ডের সভাপতি এবং রাজ্য সরকার মনোনীত দু'জন মহিলা। জেলা পনচায়েত অফিসে এবং সহকর্মী শাসকগণ সহযোগী সভ্য ভাবে কাজ করেন তাঁদের কোন ভোটাধিকার থাকে না।

জেলা পরিষদ নিজেদের ভিতর থেকে একজন চেয়ারম্যান আর একজন ভাইস্-চেয়ারম্যান নির্বাচন করবেন। জেলা স্কুল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও সহযোগী কোন সদস্য কিম্বা মিউনিসিপ্যালিটির কোন প্রেসিডেন্ট,
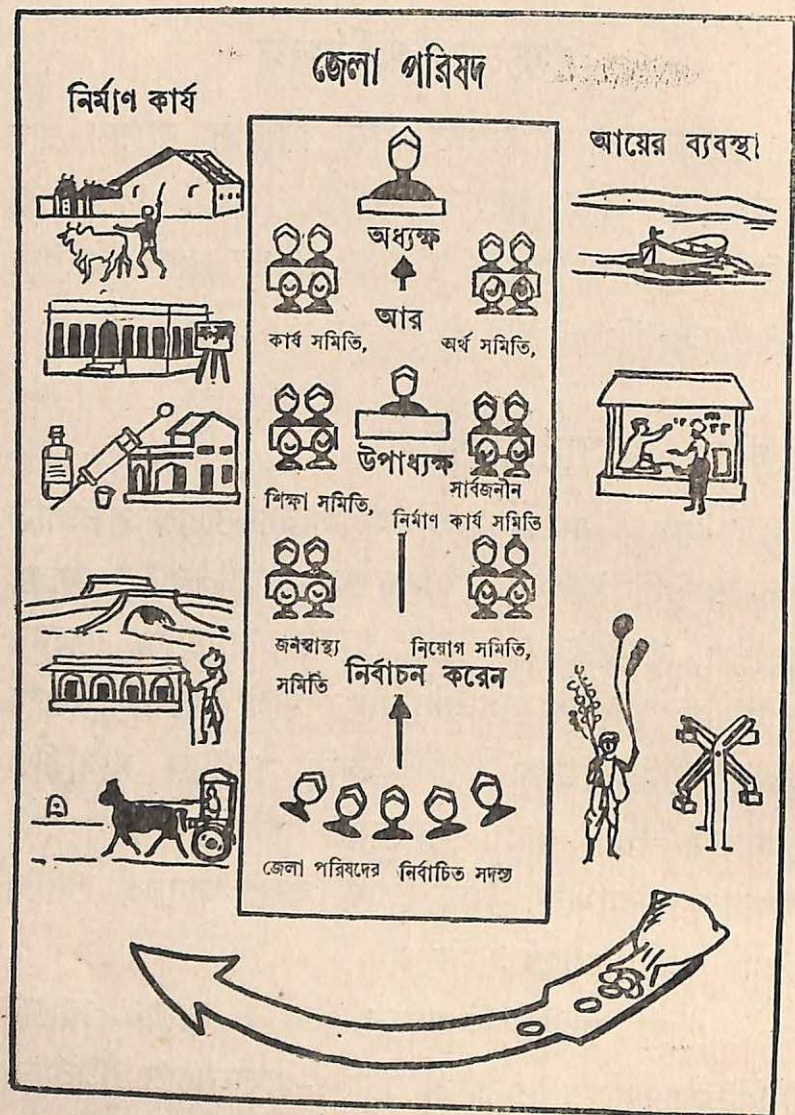
চেয়ারম্যান বা ভাইস্‌-চেয়ারম্যানের পদের জন্য খাড়া হতে পারবেন না।

জেলা পরিষদের কাজ

বাজার আর মেলার ব্যবস্থাদি করা, কুটির শিল্পের উন্নতি করা ডাক্তার খানা, ঔষধালয় খোলা, পরিবার নিয়ন্ত্রণের কাজের দেখা শোনা করা, প্রাইমারী আর জুনিয়ার উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার দেখাশোনা করা, সর্বসাধারণের ব্যবহারের রাস্তা, পুল, সাঁকো তৈয়ারী করা, রাস্তার ধারে গাছ পোঁতা, জলের ব্যবস্থা করা, আকালের সময় সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা, সাহায্য দানের ঘর, অনাথালয় ইত্যাদি তৈরী করা, গোটা জেলার উন্নতির জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করা, সর্বসাধারণের ঘাট, স্নানের জায়গার ব্যবস্থা করা, সরকারী বা অন্য কোন জায়গা থেকে পাওয়া টাকা ঠিকমত বিলি করা, এই সকল কাজ জেলা পরিষদের কাজ বলে গণ্য।

জেলা পরিষদ ট্যাক্স বসাতেও পারেন। জেলায় ধার্য ভূমির রাজস্ব থেকে রাজ্য সরকার যে অংশ জেলা পরিষদের জন্য ধার্য করবেন তা জেলা পরিষদের তহবিলে জমা হবে। কিন্তু সরকারের অনুমতি নিয়ে জেলা পরিষদ এমন সব ট্যাক্সও বসাতে পারেন যে

ট্যাক্স বসাবার অধিকার কেবলমাত্র সরকারেরই আছে। জেলা পরিষদ ভূমির ট্যাক্স থেকে যে টাকা উশুল করেন তার কিছু ভাগ গ্রাম সভাদের দিয়ে থাকেন।

জেলা পরিষদের ছয়টি সমিতি হয় ঃ—

১। কার্য নির্বাহক সমিতি, ২। অর্থ সমিতি, ৩। শিক্ষা-সমিতি, ৪। সর্বজনীন নির্মাণ সমিতি, ৫। জন স্বাস্থ্য সমিতি এবং ৬। নিয়োজন সমিতি। কার্য নির্বাহক সমিতি বিত্ত-সমিতির মতামতের ভিত্তিতে জেলা পরিষদের বাজেট তৈরী করেন। ওই বাজেট পরিষদের বৈঠকে পেশ করা হয়ে থাকে। পরিষদ বাজেটটি যেমন আছে তেমনিই পাশ করতে পারেন। নয়ত অদলবদল করার জন্য কার্য নির্বাহক সমিতির কাছে ফেরৎ পাঠাতে পারেন। এই বাজেট উন্নয়ন কমিশনারের কাছেও পাঠানো যেতে পারে।

নগর মহাপালিকা

['নগর মহাপালিকা' পনচায়েতের কায়দায় ভারতের সহরে ও নগরে কাজ করার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু এখনও তা কার্যতঃ চালু হয় নি। নগর সভা বা মিউনিসিপ্যালিটি বর্তমানে সহরের কাজকর্ম করে থাকে। নগর মহাপালিকা নগরসভাগুলিরই উন্নত সংগঠন।]

গ্রাম-পনচায়েত, আঞ্চলিক পরিষদ আর জেলা পরিষদ গ্রামের যা দরকার সে কাজ করেন। কিন্তু আমাদের দেশে গ্রাম ছাড়াও অনেক সহর আছে। সহরের সংক্রান্ত যা কিছু কাজ তা প্রধানত নগর-পালিকা করে থাকে। অবশ্য কোন বড় সহরের জন্য সরকার নগর মহাপালিকা গঠন করতে পারেন। নগর পালিকা বা নগর মহাপালিকার নির্বাচনে সেই সকল লোকেরা অংশ নিতে পারেন যাঁদের নাম ওই সহরের ভোটার তালিকায় আছে। নির্বাচনের জন্য সহরকে এলাকা বা ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়। প্রতি এলাকা বা ওয়ার্ড সেখানকার লোকদের মধ্যে থেকে একজন বা একের বেশী প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারেন।
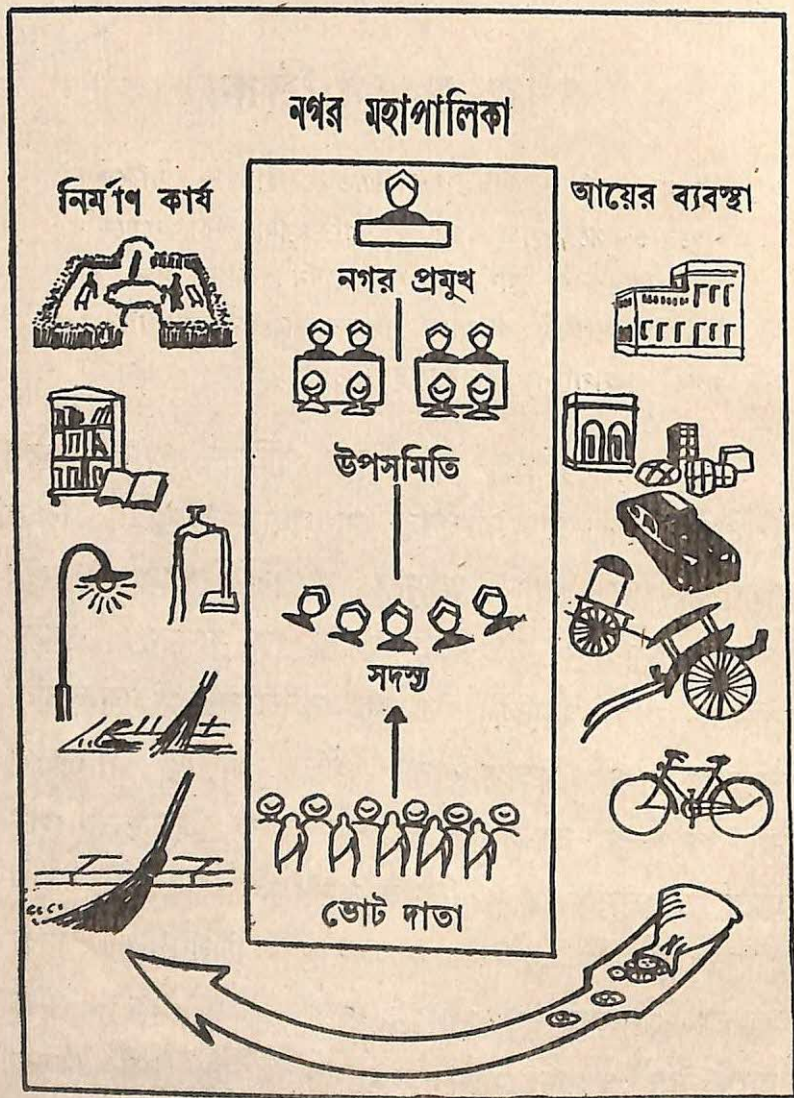
নগর মহাপালিকার সভাপতিকে নগর-প্রমুখ বলা হয়। একজন উপ-প্রমুখও থাকেন। মহাপালিকা

কয়েকটি ছোট ছোট সমিতি তৈরী করে দেন। প্রতি সমিতির একজন করে সভাপতি থাকেন। মোটামুটি শিক্ষা-সমিতি, নগর পরিষ্কার এবং ঔষধ ও মাদক দ্রব্য সমিতি, খাদ্য ও পানীয়ের জিনিসপত্রের দেখাশোনা করার সমিতি আর আমদানী রপ্তানীর মাশুল বা চুংগী সমিতি এইগুলি নগর মহাপালিকা গঠন করেন।

মহাপালিকাকে সহায়তা করার জন্য সচিব আর ইনজিনিয়ার থাকেন। মহাপালিকাই এঁদের নিয়োগ করেন। মহাপালিকার কাজ জেলা পরিষদের সংগে অনেক জায়াগায় মিলে যায়। তফাৎ কেবল এইমাত্র যে জেলা পরিষদ সারা জেলার সকল গ্রামগুলির জন্য কাজ করে থাকেন আর মহাপালিকা কেবল সহরের জন্যই কাজ করেন। সহরের ব্যবসা বাণিজ্য অনেক বড়। এখানকার অধিবাসীদের আয় রোজগারও অনেক বেশী। এই জন্য নগর মহাপালিকার আয়ও হয় অনেক বেশী।

নগর মহাপালিকা সহরে শিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকেন। হাসপাতাল, খেলাধূলার মাঠ আর গ্রন্থাগার, যাদুঘর ইত্যাদি খোলেন। রাস্তা বানান, সহরকে ময়লা থেকে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন রাখেন। পচা গলা খাবার বিক্রী করতে দেন না। জল আর বাতি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ঘর বাড়ি তৈরীর নক্সা মনজুর করেন।
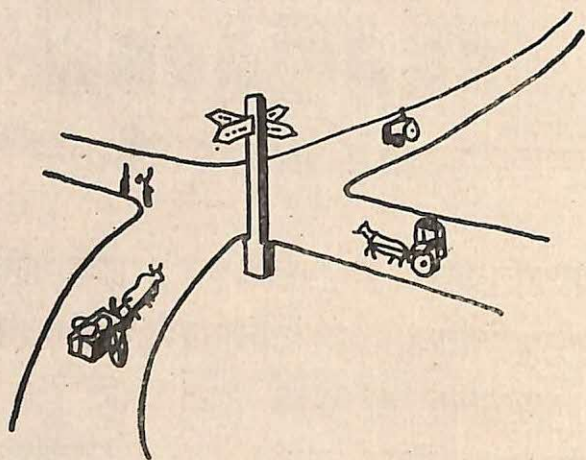
এই সকল কাজকর্ম চালাবার জন্য মহাপালিকা বাতি, জল, বাড়ী, যাত্রী আর সওয়ারীর উপর কর ধার্য করেন। সহরের বাইরে থেকে যে মাল আসে তার ওপর চুংগী বা বিশেষ কর লাগান। এ ছাড়া রাজ্য সরকারের কাছ থেকেও সাহায্য মেলে।

রাজ্য বিধান মণ্ডল

আমাদের দেশকে ১৬টি রাজ্য আর ৯টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। রাজ্যগুলি হল ঃ

১। আসাম
২। অন্ধ্র প্রদেশ
৩। ওড়িষা
৪। উত্তর প্রদেশ
৫। কেরল
৬। গুজরাত বা সৌরাষ্ট্র
৭। জম্মু আর কাশ্মীর
৮। পান্জাব
৯। পশ্চিম বাংলা
১০। বিহার
১১। মাদ্রাজ
১২। মধ্য প্রদেশ
১৩। মহারাষ্ট্র
১৪। মহিশূর
১৫। রাজস্থান
১৬। হরিয়ানা

কেন্দ্রাধীন অঞ্চলগুলি হল ঃ

১। আন্দামান আর নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ
২। গোয়া, দমন আর দিউ
৩। দিলল্লী
৪। দাদরা আর নগর হাবেলী
৫। পণ্ডিচেরী
৬। মনিপুর
৭। লাক্ষাদ্বীপ সমূহ
৮। হিমাচল প্রদেশ
৯। ত্রিপুরা

এছাড়া আসাম রাজ্যের ভিতরে পড়ে দুটি অঞ্চল— নেফা আর নাগাভূমি। এরা ভারত সরকারের দেখা

শোনায় রয়েছে। নাগাভূমি আলাদা একটি রাজ্য হবে কিনা তা নিয়ে এখন নাগা নেতাদের সংগে ভারত সরকারের আলোচনা চলেছে।

প্রতি রাজ্যের শাসনের কাজ চালানোর জন্য সেখানে এক একটি বিধান মণ্ডল থাকে। এই বিধান মণ্ডলের একটি বা দুটি সভা থাকে। একটি সভাকে

রাজ্য বিধান মনডল

বলা হয় বিধান সভা আর অন্যটিকে বিধান পরিষদ বলা হয়। দুটি সভাকে একত্রে বিধান মণ্ডল বলা হয়। বিধান সভার নির্বাচন হয়। প্রতি সাধারণ নির্বাচনে আমরা আমাদের ভিতর থেকে একজন প্রতিনিধিকে নির্বাচন করে বিধান সভায় পাঠাতে পারি।

বিধান পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী ভোটার, মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক আর বিধান সভার সদস্যরা এই তিন পক্ষ। কোন কোন রাজ্যে মাত্র একটি বিধান সভাই শুধু থাকে। উত্তর প্রদেশে, পশ্চিম-বাংলায় দুটি সভাই আছে। প্রত্যেক রাজ্যের বিধানমণ্ডল তাঁদের কাজকর্ম রাজ্যের রাজধানীতে বসে করেন।

বিধানসভার কাজ কি ?

বিধানসভার এথ্‌তেয়ার হল—রাজ্যের জন্য আইন তৈরী করা আর কর ধার্য করা। রাজ্য সরকারের সমস্ত খাজনা আর অন্যান্য আয়ের দায়িত্বও তার হাতে। সেই টাকা খরচা করার হুকুম দেওয়া তার হাতে। বিধান সভায় আমাদের তেমন প্রতিনিধিকেই পাঠাতে হবে যিনি সৎ আর খুব দক্ষ লোক। প্রতি
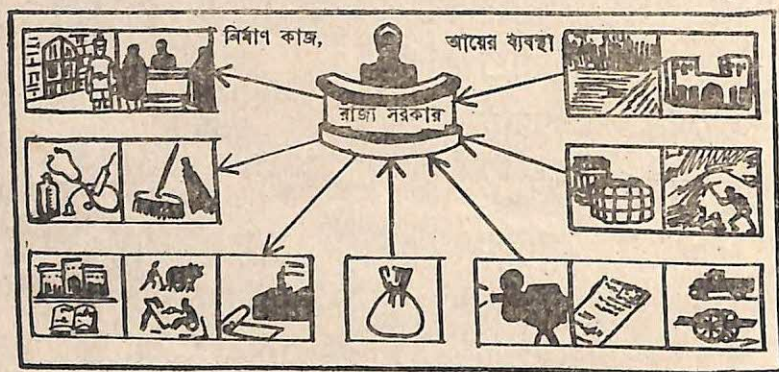
৭৫,০০০ জন সংখ্যা পিছু একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচন করা যেতে পারে। কোন বিধান সভায় ৫০০-র বেশী আর ৬০-এর কম প্রতিনিধি হওয়া চলবে না।

এই প্রতিনিধিদের পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচন করা হয়। একটি বিধান সভার অনেকগুলি দল

থাকে। সভায় যে দলের সদস্য সংখ্যা সবচেয়ে বেশী সেই দলকেই সরকার গড়বার অধিকার দেওয়া হয়। রাজ্যপাল সেই দলের নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী বানান। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী অন্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করেন। এই সকল মন্ত্রীদের নিয়ে মন্ত্রী মণ্ডলী তৈরী হয়।

বছরে কমপক্ষে অন্তত দুবার করে বিধান সভার বৈঠক ডাকা হয়। এই বৈঠককে বলা হয় বিধান সভার অধিবেশন। বিধান সভা একজনকে অধ্যক্ষ নির্বাচন করেন তাঁদের মধ্য থেকে। অধ্যক্ষ অধিবেশনে কাজকর্ম চালান।

বিধান সভা কি করেন'

বিধান সভার উপর রাজ্যের শান্তি, শৃঙ্খলা রক্ষা করার ভার থাকে। এর জন্যে বিধান সভা পুলিশ, বিচার বিভাগ আর জেলখানার ব্যবস্থাদির বিধান করেন। জন-স্বাস্থ্য আর পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার তদারক করেন। চিকিৎসালয় আর ঔষধালয় খোলেন, উচ্চ বিদ্যালয় খোলেন, ক্ষেত-খামার আর কুটির শিল্পের প্রসারে সহায়তা করেন, কলকারখানার তদবির-তদারক করেন। নেশার সামগ্রীর ওপর নজর নিয়ন্ত্রণ

রাখেন। নগর মহাপালিকা, জেলা পরিষদ, গ্রাম পন্-চায়েত আর ন্যায় পন্চায়েতের সংগে যোগাযোগ করেন, এদের জন্য আইন তৈরী করেন আর কর ধার্য করেন।

রাজ্যে আয়ের নানা পথ আছে। সব থেকে বেশী আয় ভূমি রাজস্ব থেকে আসে। রাজ্য কৃষি আয়ের উপর কর বসাতে পারেন। বাড়ি আর খনির উপর কর বসাতে পারেন। বাইরে থেকে যে সব মাল রাজ্যে বিকোতে আসে তার ওপর কর বসানো হয়। মটোর আর ঠেলা গাড়ির উপর কর বসানো হয়। আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাদির উপর কর উশুল করা হয়। আদালতের টিকিট বিক্রী থেকেও অর্থ আমদানী হয়। কেন্দ্রীয় সরকারও সাহায্য দেন।

বিধান পরিষদের এক তৃতীয়াংশ সদস্যদের প্রতি দু'বছর বাদে অবসর দেওয়া হয়। তাঁদের জায়গায় নূতন সদস্যদের নির্বাচন করা হয়। এইভাবে বিধান পরিষদ বরাবরই কায়েম থাকে। এই পরিষদের সদস্য সংখ্যা বিধান সভার সদস্য সংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ বা তার চেয়েও কম হয়। এতে কমপক্ষে 40 জন সদস্য থাকেন।

বিধান পরিষদের এক তৃতীয়াংস সদস্যদের নির্বাচন

করে নগর মহাপালিকা, জেলা পরিষদ ইত্যাদির সদস্যরা।

কিছু সংখ্যক সদস্যকে এমন লোকেরা নির্বাচন করেন যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পাওয়া লোক।

কিছু সদস্যকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকেরা নির্বাচন করেন। এই নির্বাচনে সেই শিক্ষকেরাই অংশ নিতে পারেন যাঁরা কমপক্ষে তিন বছর শিক্ষকতা করেছেন।

পরিষদের বাকি এক তৃতীয়াংশ সদস্যকে বিধান সভার সদস্যরা নির্বাচন করেন। বাকি সদস্যদের রাজ্যপাল ইচ্ছামত বাছাই করেন। পরিষদের সদস্যরা একজন সভাপতি আর একজন উপ-সভাপতি নির্বাচন করেন।

বিধান সভা আর বিধান পরিষদের সদস্যদের সরকারী তহবিল থেকে ভাতা মেলে। এঁরা বিধান সভা আর বিধান পরিষদে কথা বলার অধিকার রাখেন।

বিধানমণ্ডল কোন একটা নূতন কানুন করা যদি বিবেচনা করেন তা হলে সেটির জন্য মুসাবিদা করেন বা খসড়া আকারে সেটি পেশ করেন সভায়। এই মুসাবিদা দু' রকমের হয়ঃ

১। টাকাকড়ির মুসাবিদা ২। সাধারণ মুসাবিদা।

যে মুসাবিদা (ক) সরকারী রাজস্ব থেকে কোনো রকম খরচ করার জন্য বা তাতে জমা করার জন্য করা হয়, (খ) কোনো রকম সাহায্যদানের আদেশ করে (গ) কোনো নূতন কর বা ট্যাক্স বসাতে চায় বা কোনো চলতি ট্যাক্স কমিয়ে দিতে বলে—এই সব কিছুকেই ধনের বা অর্থের মুসাবিদা বলা হয়।

যে যে ব্যাপারে অর্থ বরাদ্দ করা হয় বা তা কম করার মুসাবিদা করা হয় সেগুলি ছাড়া আর অন্য সব কিছু বিষয়কেই সাধারণ মুসাবিদা বলা হয়।

সাধারণ মুসাবিদা যে কোন সভায় পেশ করা যেতে পারে। এই মুসাবিদাকে বলা হয় বিল, প্রস্তাব ইত্যাদি। প্রস্তাব পেশ করার পর তা অধিক সদস্যের ভোটে যদি পাশ হয়, তখন অন্য সভায় তা পাঠানো হয়। দুই সভায় মঞ্জুর হলে সেটি রাজ্যপালের কাছে পাঠানো হয়। যখন রাজ্যপাল তার ওপর দস্তখত করে মঞ্জুর করেন তখন তা একটি আইনে পরিণত হয়।

টাকাকড়ির মুসাবিদা কেবল মাত্র বিধান সভায় পেশ করা যেতে পারে। বিধান সভায় এই প্রস্তাব পাশ হলে পর বিধান পরিষদ যদি তার ওপর এমন মত

দেন যা বিধান সভা মেনে নিতে পারেন না, বা বিধান পরিষদ চৌদ্দ দিনের মধ্যে কোন রায় দিতে না পারেন তখন প্রস্তাবটি উভয় সভাতেই পাশ হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু যদি বিধান পরিষদের মতামত বিধান সভা মেনে নেন আর সেই অনুসারে মুসাবিদা মঞ্জুর করেন তা হলে আর দ্বিতীয়বার বিধান পরিষদের মত নেওয়ার দরকার হয় না। দুই সভাই তা মঞ্জুর করেছে ধরা হয়।

দেশের সবচেয়ে বড় সভা

দেশের সবচেয়ে বড় সভা হল সংসদ। এই সভা সারা দেশের হিত আর কল্যাণ সাধণের জন্য চেষ্টা করে। সংসদের দুটি সভা আছে। একটিকে বলা হয় লোক সভা আর অন্যটিকে বলা হয় রাজ্য সভা।

লোক সভা

লোক সভার জন্যও নির্বাচনী ক্ষেত্র বা এলাকা স্থির করা হয়। পাঁচ লাখ থেকে সাড়ে সাত লাখ লোকের বসতিপূর্ণ এলাকা—এই হিসাবে এক একটি

লোক সভার নির্বাচনী কেন্দ্র বা এলাকা স্থির হয়। প্রতি কেন্দ্র থেকে এক বা একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচন
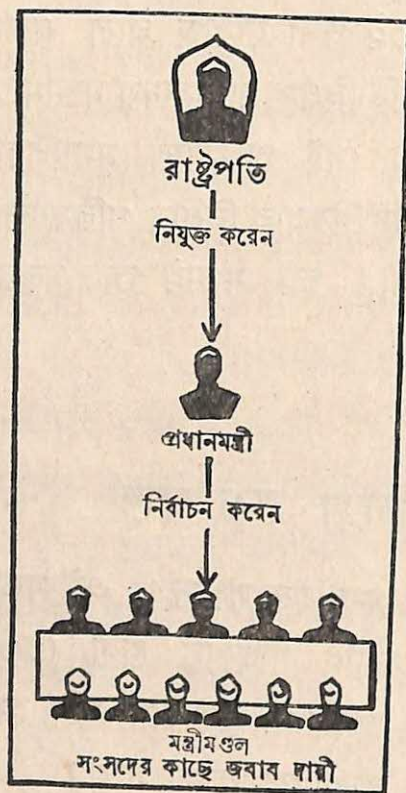
করা হয়। লোক সভায় অনধিক ৫00 জন সদস্য থাকেন। লোক সভা পাঁচ বছর অবধি কাজ করতে পারে। তারপরে আবার নির্বাচন হয়।

লোক সভা একজন অধ্যক্ষ আর একজন উপাধ্যক্ষ নির্বাচন করে। অধ্যক্ষ লোক সভার কাজকর্ম পরিচালনা করেন। অধ্যক্ষ যদি হাজির না থাকতে পারেন তখন উপাধ্যক্ষ তাঁর জায়গায় কাজ করেন।

লোক সভায় অনেকগুলি দল থাকে। এই সভায় যে দলের সবচেয়ে বেশী লোক থাকে সেই দলই সরকার বানায়। রাষ্ট্রপতি সেই দলের নেতাকে প্রধান মন্ত্রীরূপে

নিযুক্ত করেন। প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি অন্য মন্ত্রীদেরও নিযুক্ত করেন।

রাজ্য সভা

বিধান পরিষদের মতই রাজ্য সভার মোট সদস্যের তিন ভাগের এক ভাগ প্রতি দু'বছর অন্তর বদল হয়। এঁদের জায়গায় নূতন সদস্য নির্বাচিত হন। রাজ্য সভায় অনধিক ২৫০ জন সদস্য থাকেন। এঁদের মধ্যে বারজন থাকেন বিশেষ গুণী ব্যক্তি। তাঁদের রাষ্ট্রপতি নিজে মনোনীত করেন। রাজ্য সভার সদস্যদের বিধান সভার সদস্যরা নির্বাচন করেন। এই সভায় কেন্দ্রের অধীন ক্ষেত্রসমূহের প্রতিনিধিরাও থাকেন।

সংসদেও সাধারণ বিষয়ে কোন মুসাবিদা যে কোন সভায় পেশ করা যায়। যে অবধি কোন বিল বা প্রস্তাব দুই সভাতেই পাশ না হয়, সে অবধি তা রাষ্ট্রপতির কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠান হয় না। যদি দুই সভায় মতভেদ হয়, তা হলে দুই সভার একত্রে বৈঠক হয় আর মতভেদ দূর করার চেষ্টা হয়।

অর্থ সংক্রান্ত মুসাবিদা রাজ্য বিধানমণ্ডলে যে ভাবে মঞ্জুর করা হয়, সেইভাবে সংসদেও হয়। অর্থের

মজুরী ব্যাপারে যেমন রাজ্য বিধান পরিষদের মতামতের কোন জোর নেই তেমনি সংসদেও রাজ্য সভার এ ব্যাপারে কোনও মতের গুরুত্ব নেই।

রাষ্ট্রপতি

পুরো দেশের শাসনের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির হাতে থাকে। রাষ্ট্রপতিকে লোক সভা, রাজ্য সভা আর
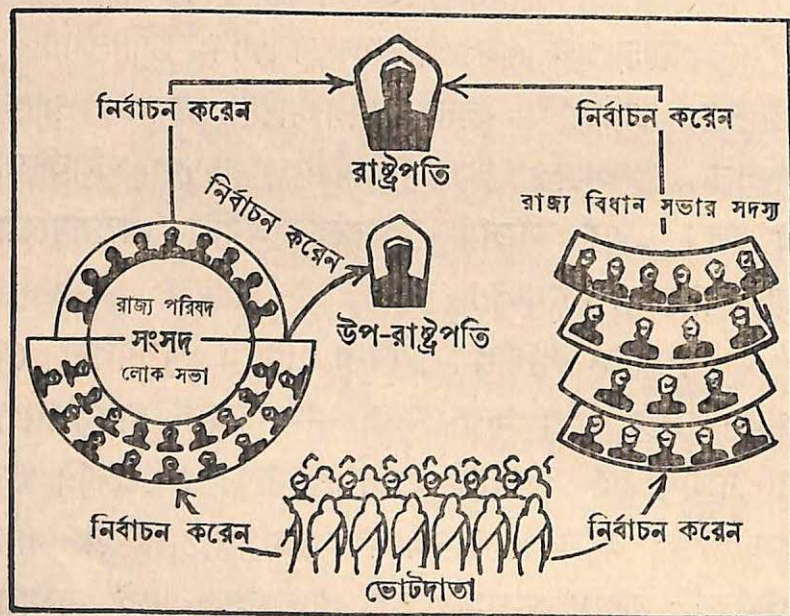
রাজ্যের বিধান সভার সদস্যরা নির্বাচন করে থাকেন। রাষ্ট্রপতি মাসিক ১0,000 টাকা বেতন পান। তাঁর বসবাসের জন্য বাড়ির ভাড়া দিতে হয় না। যে বাড়িতে

তিনি থাকেন তাকে রাষ্ট্রপতি ভবন বলে। রাষ্ট্রপতি ভবন দিল্লীতে।

উপ-রাষ্ট্রপতি

উপরাষ্ট্রপতিকে লোক সভা আর রাজ্য সভা নির্বাচন করেন। প্রয়োজন হলে উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির জায়গায় কাজ করতে পারেন। উপ-রাষ্ট্রপতি রাজ্য সভার সভাপতিরূপেও থাকেন।

রষ্ট্রপতির অধিকার

গোটা দেশের ভালমন্দের ভার রাষ্ট্রপতির হাতে। তিনিই প্রধান সেনানায়ক। তিনি অপরাধীর সাজা কমাতে বা মকুব করতে পারেন। তিনি ফাঁসীর দণ্ডকেও মাফ করে দিতে পারেন।

রাজ্যপাল, রাজদূত, রাজ্যের হাইকোর্ট আর দেশের সবচেয়ে উপরের আদালত, সুপরীম কোর্টের বিচারপতিকে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন। সংসদ লোক-সভা আর রাজ্য সভায় যে প্রস্তাব পাশ করেন তার ওপর রাষ্ট্রপতি দস্তখত করলে পরই তা আইনে পরিণত হয়।

রাষ্ট্রপতি পিছিয়ে থাকা জাতিগুলির উন্নতি বিধান করা সম্পর্কে নিজে ভার নেন। যদি দেশের

উপর বাইরে থেকে হামলার বিপদ দেখা দেয়, তখন তিনি দেশে বিপজ্জনক বা জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে দু' মাসের জন্য যে কোন ধরনের আইন চালু করতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি দেশের মধ্যে কোন গোলমাল বিশৃঙ্খলা অরাজকতা দেখা দিলেও বিপজ্জনক বা জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। যদি কোন রাজ্যে দেখা যায়, যে ঠিক সংবিধানের নিয়মগুলি অনুসারে শাসন চলছে না, তখন রাষ্ট্রপতি সে রাজ্যের শাসনভার আপনার হাতে নিয়ে নিতে পারেন। যতদিন সেই রাজ্যে নতুন নির্বাচন না হয় আর সংবিধান অনুসারে নতুন সরকার না গঠন করা হয়, ততদিন তিনিই সে রাজ্যের শাসন চালান।

মন্ত্রীমণ্ডল

রাষ্ট্রপতি তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলের পরামর্শ অনুসারে কাজ করেন। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীমণ্ডলের যা কিছু কাজের বিষয়াদি রাষ্ট্রপতিকে জানান। রাষ্ট্রপতি যদি তাঁদের প্রস্তাব ছাড়াও অন্য কোন কর্মসূচী চান তা হলে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে সেইটিই দেন।
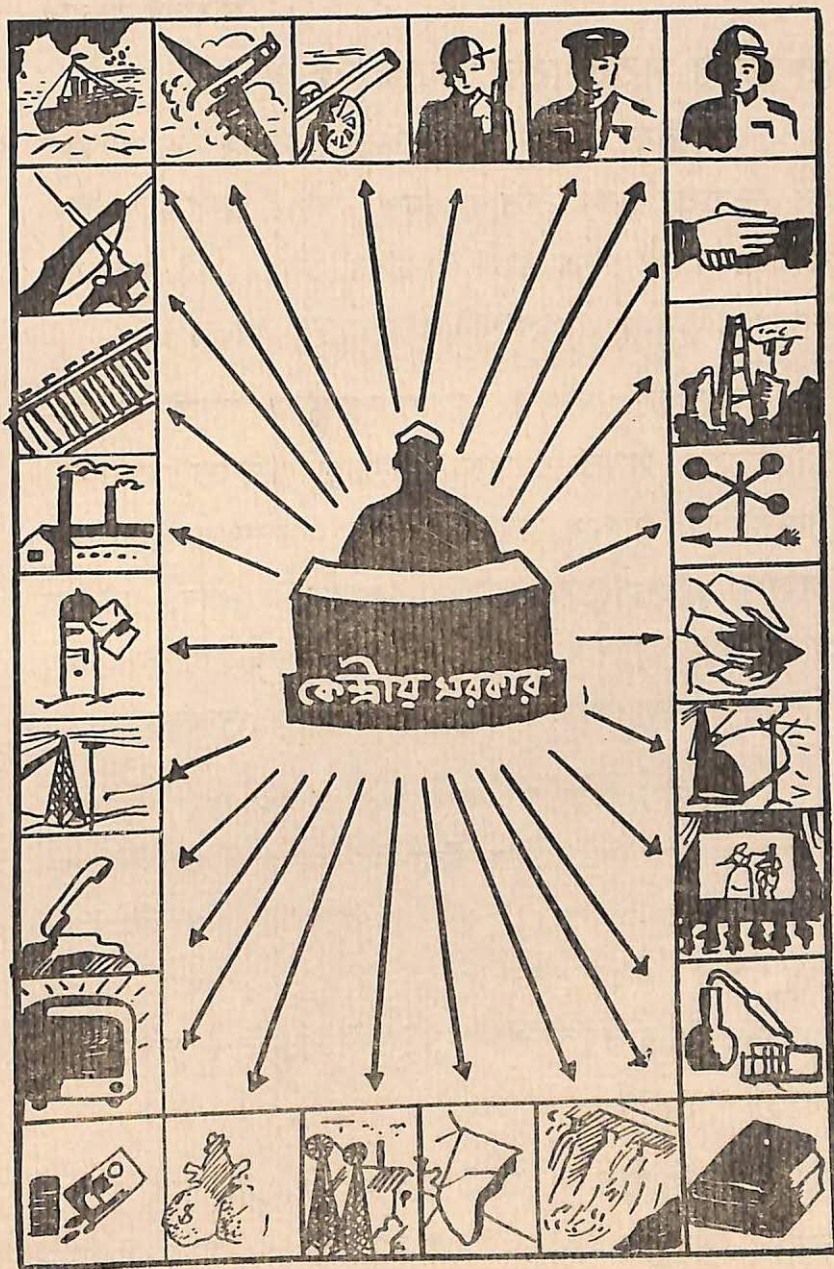
কেন্দ্রীয় সরকার

কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ কি ?

কেন্দ্রীয় সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় সওয়াল হল দেশকে রক্ষা করা। জল, স্থল আর আকাশ প্রতিরক্ষার সেনাদের জন্যে তৈরী রাখেন। এই সেনাদের জন্যে হাতিয়ার, গোলাগুলির ব্যবস্থা করেন।

অন্যান্য দেশের সংগে বন্ধুতা আর ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক গড়ে তোলার কাজ করেন। বিদেশীদের এদেশে আসা আর এদেশের লোকের বিদেশে যাতায়াতের ব্যবস্থা করেন। রেল, জাহাজ আর বিমান চলাচলের ব্যবস্থা করেন। ডাক, তার, টেলিফোনাদির যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন।

কেন্দ্রীয় সরকার দেশের মধ্যে মুদ্রা চালু করেন। টাঁকশাল খোলেন আর বিদেশী মুদ্রার অদল বদলের ব্যবস্থা করে থাকেন। খনি খননের ব্যবস্থা করেন। রাজ্যগুলির মধ্যে কেনা বেচা আর বিদেশের সংগে ব্যবসা বাণিজ্যের নিয়মকানুন তৈরী করেন। জলসেচের ব্যবস্থা করেন।

উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। সিনেমা আর ফিল্ম দেখানো মঞ্জুর করেন। রেডিও ষ্টেশন আর বিদ্যুত

সরবরাহের কেন্দ্র তৈরী করেন। দেশের উন্নতির জন্য পরিকল্পনা তৈরী করেন।

এই সব খরচের টাকা কোথা থেকে আসে ?

কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের অনেক বড় বড় পথ আছে। তার মধ্যে কয়েকটি হলঃ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন রেল, ডাক আর তার বিভাগ থেকে মোটা আয় হয়। এদেশ থেকে যে মাল বাইরে রপ্তানী হয়, আর বাইরে থেকে যে মাল এ দেশে আসে তার উপর সরকার কর বসান। বিদেশ থেকে মানুষ এলে তার উপরেও কর ধার্য হয়। খেত-খামারের জমি ছাড়া অন্য জমির উপরেও কর উশুল করা হয়। তামাক, মদ, আফিম, গাঁজা আর অন্যান্য নেশার জিনিসের উপর কর বসানো হয়।

যে সব কাজকর্মের দেখাশোনা রাজ্য আর কেন্দ্রীয় সরকার মিলিতভাবে করে থাকেন

কিছু কাজকর্মের দেখাশোনার ভার কেন্দ্রীয় আর রাজ্য সরকার উভয় মিলে নিয়ে থাকেন। তার কয়েকটি হলঃ

১। ফৌজদারী নিয়ম কানুন, ২। মাল সম্পর্কিত কানুনাদি, ৩। জন্ম মরণের খবর লেখা, ৪। বিবাহ, বিবাহ বাতিল, ৫। খবরের কাগজ, বই প্রকাশ করা আর ছাপাখানা, ৬। যোজনা, ৭। বিদ্যুৎ, ৮। জিনিস-পত্রের মূল্যের উপর নিয়ন্ত্রণ, ৯। শ্রমিক কল্যাণ, ১০। কল কারখানা, ১১। খাদ্য আর অন্য জিনিসে ভেজাল রোধ করা, ১২। ট্রেড ইউনিয়ন, ১৩। রোজগার আর বেকারী, ১৪। পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন, ১৫। ধর্ম প্রতিষ্ঠান, ১৬। শ্রমিকদের উপার্জনের সহায়ক শিক্ষা।

আদালত

আমাদের দেশের গ্রামগুলিতে ছোটখাটো মামলার বিচার ফয়শলা ন্যায় পনচায়েতই করে। কিন্তু বড় বড় মামলার ফয়শলা করতে হলে অনেক সুক্ষ্ম বিচার বিবেচনা করার দরকার হয়। এর জন্যে বড় আদালত বানানো হয়েছে। আমাদের সংবিধান আমাদের অনেক
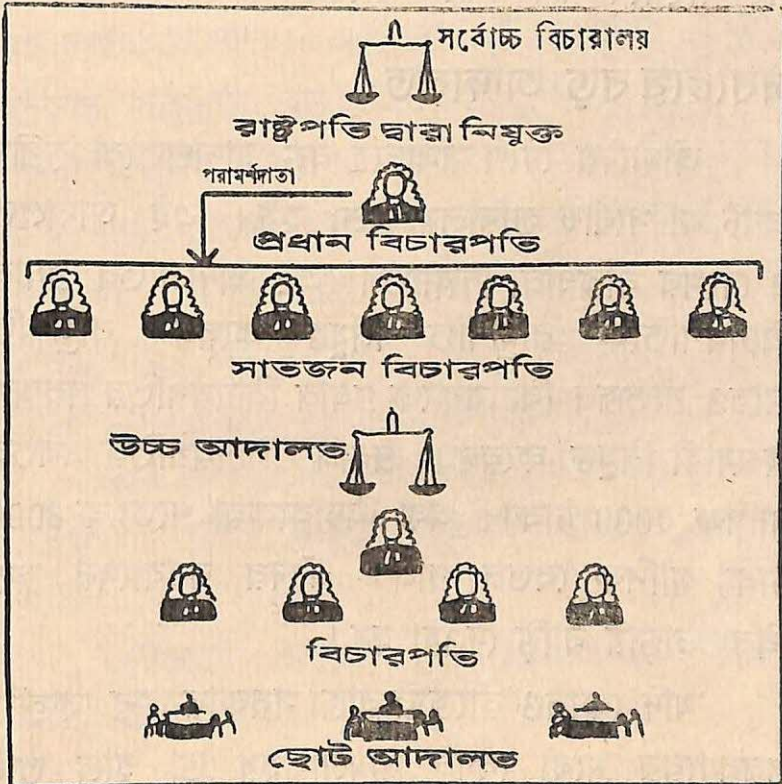
অধিকার দিয়েছেন। কোন বিধান সভা এইসব অধিকারের বিরুদ্ধে কোন আইনই তৈরী করতে পারেন না। যদি তাঁরা তেমন কিছু করে বসেন তা হলে দেশের সবচেয়ে বড় আদালত সুপরীম কোর্টে বা হাইকোর্টে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যেতে পারে। যদি সেই মামলার স্বপক্ষে রায় হয় তা হলে আদালত সেই আইনকে রদ করতে পারেন।

সবচেয়ে বড় আদালত

আমাদের দেশে সবচেয়ে বড় আদালতকে সুপ্রীম কোর্ট বা সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় বলা হয়। এই আদালত এ দেশের রাজধানী দিল্লীতে। এই আদালতের প্রধান বিচারপতিকে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন। রাষ্ট্রপতি আরও সাতজন বিচারককে প্রধান বিচারপতির পরামর্শ অনুযায়ী নিযুক্ত করেন। প্রধান বিচারপতির বেতন মাসিক ৫000 টাকা। অন্য বিচারকেরা প্রত্যেকে ৪000 টাকা মাসিক বেতন পান। এঁদের বসবাসের জন্য বিনা ভাড়ায় বাড়ি দেওয়া হয়।

যদি কোনও রাজ্যের রাজ্য সরকার আর কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে কোন মামলা হয় তা হলে তার

ফয়শলা এই আদালতই করে থাকেন। যদি কোন মামলায় কোন আইনের ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ দেখা দেয় তখনও এই আদালত তার শেষ ফয়শলা করেন।

এই আদালত ২০,০০০-এর চেয়েও বেশী রকম দেওয়ানী মামলার আপীলে ফয়শলা করতে পারেন।

হাইকোর্ট

রাজ্যের সবচেয়ে বড় আদালতকে উচ্চ ন্যায়ালয় বা হাইকোর্ট বলে। এর প্রধান বিচারককে রাষ্ট্রপতি দেশের সবচেয়ে বড় বিচারপতি, আর রাজ্যপালের পরামর্শ অনুযায়ী নিযুক্ত করেন। অন্য বিচারকদের হাইকোর্টের প্রধান বিচারকের পরামর্শ অনুসারে নিযুক্ত করা হয়। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি চার হাজার টাকা মাসিক বেতন পান। অন্য বিচারকেরা প্রত্যেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা মাসিক বেতন পান।

নীচের আদালতগুলিতে কোন আইনের ব্যাখ্যা নিয়ে গড়বড় দেখা দিলে হাইকোর্ট সেইসব মামলার ফয়শলা করেন।

হাইকোর্ট নীচের আদালতগুলিরও কাজকর্ম দেখাশোনা করেন।

জেলা আদালত

সব জেলাতেই জেলা আদালত আছে। জেলা আদালতের বিচারককে রাজ্যপাল নিযুক্ত করেন। তিনি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পরামর্শ অনুযায়ী এঁকে নিযুক্ত করেন। জেলা বিচারক নীচের আদালতের কাজকর্মের দেখাশোনা করে থাকেন। তিনি নীচের আদালতের মামলার আপীলের ফয়শলাও করে থাকেন।

উপরে লেখা সকল আদালতগুলির বিচার করার স্বাধীনতা রয়েছে। এদের ওপর সরকারের কোন জোর নেই। এদের সম্বন্ধ রাজ্যপাল আর রাষ্ট্রপতির সংগে সরাসরি। প্রধানমন্ত্রী আর মুখ্যমন্ত্রী এদের কাজে কোন দখল দাবী করতে পারেন না।

মূল অধিকার

সংবিধান আমাদের কয়েকটি মূলঅধিকার দিয়েছে। আমাদের সকলের উন্নতি, সুখ আর শান্তির জন্যে এ অধিকারগুলি অত্যন্ত দরকারী। কোন পন্চায়েত বা কোন সভাই এই অধিকারের বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে পারে না। যদি এদের বিরুদ্ধে কোন কাজ করা হয় তাহলে তার অভিযোগ উচ্চ আদালতে করা যেতে পারে। উচ্চ আদালত এই অধিকারগুলি রক্ষা করবেন।

প্রধান মূল অধিকারগুলি নীচে লেখা হল ঃ
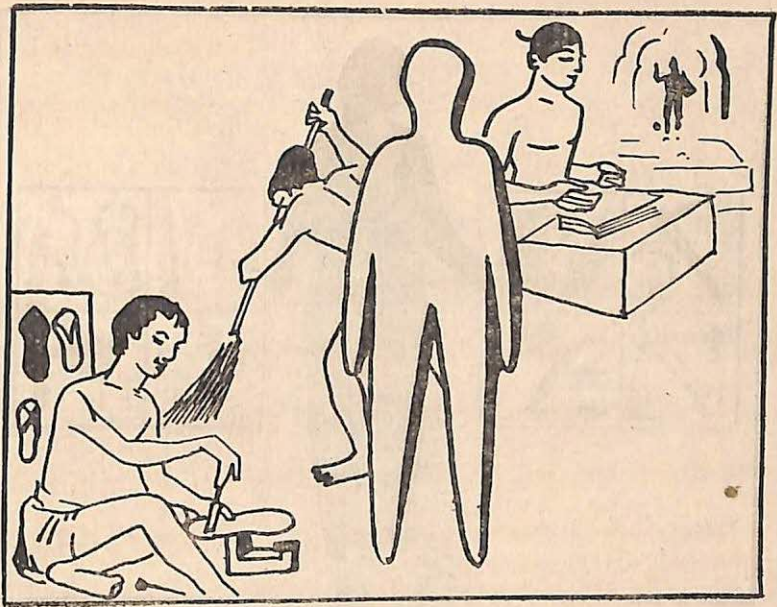
১। সকলের সমান অধিকার।
২। মনের কথা বলা, লেখা আর স্বাধীনভাবে মেলামেশার অধিকার।
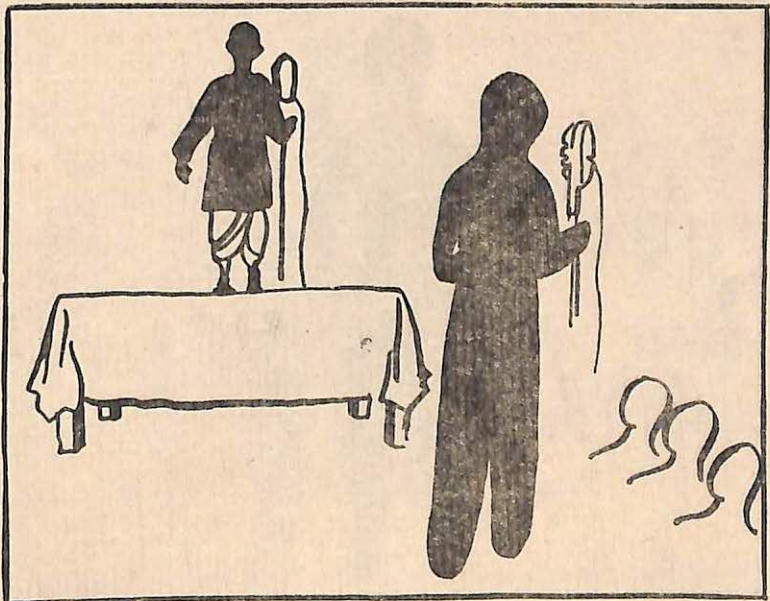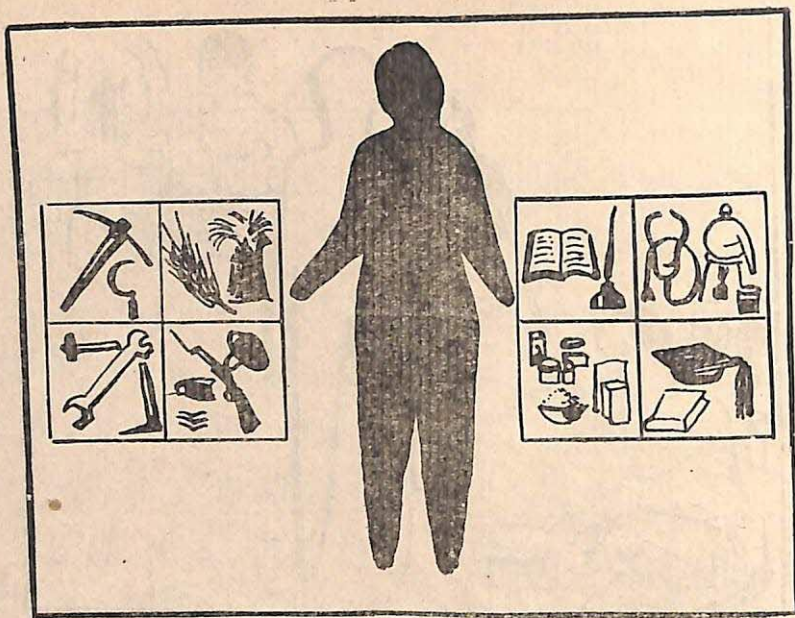
৩। আপনার মেহনতের ফল ভোগ করার অধিকার।

৪। নিজের মনোমত ধর্ম পালন করার অধিকার।
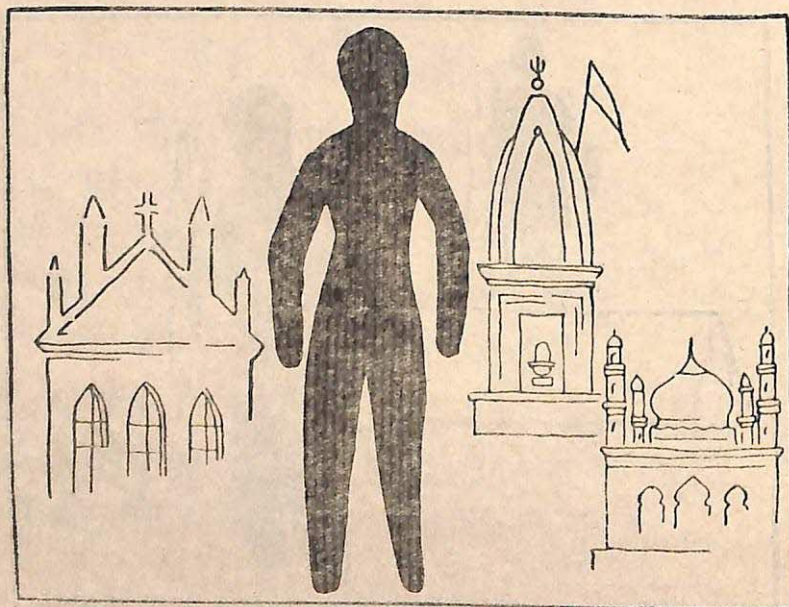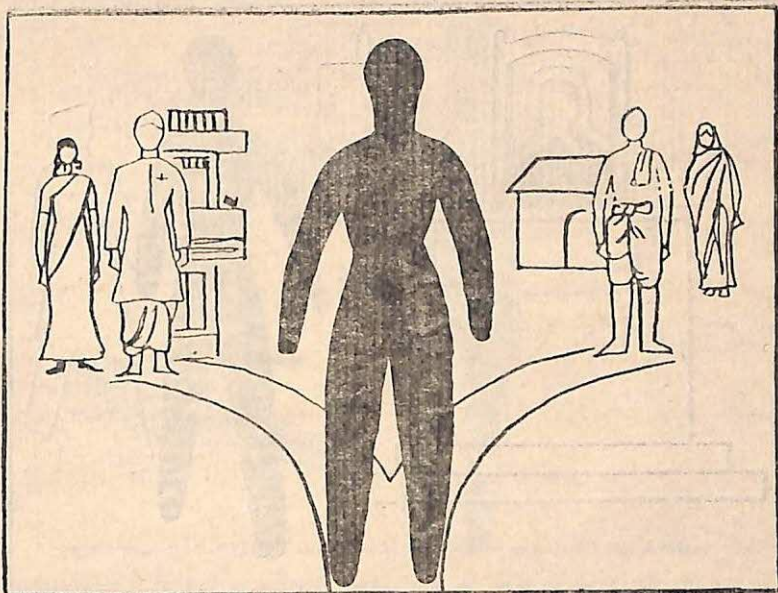
৫। আপনার সংস্কৃতি অনুযায়ী জীবন-যাপন করা আর শিক্ষা পাওয়ার অধিকার।
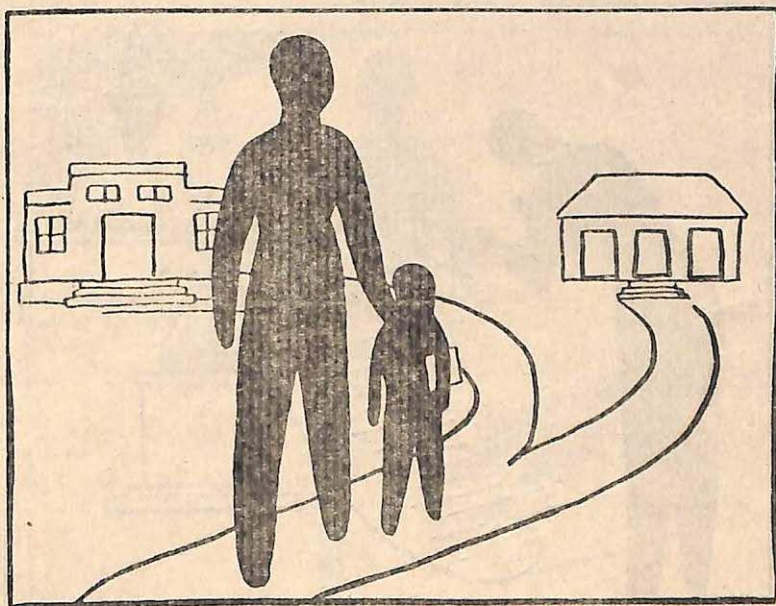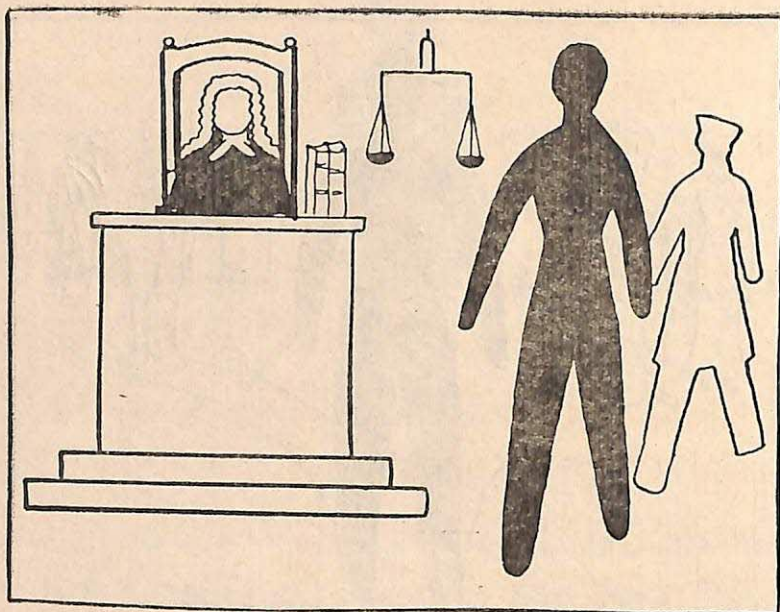
৬। মূল অধিকার হরণ করার বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করার অধিকার।
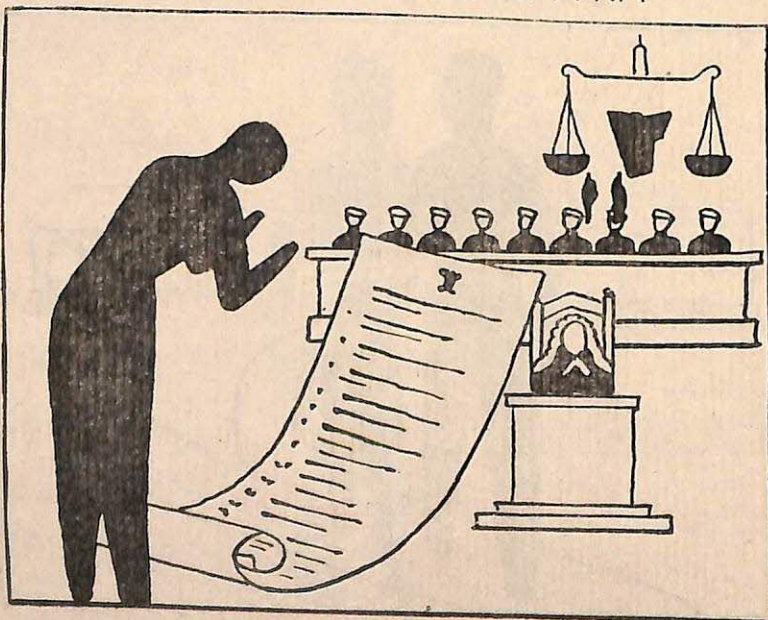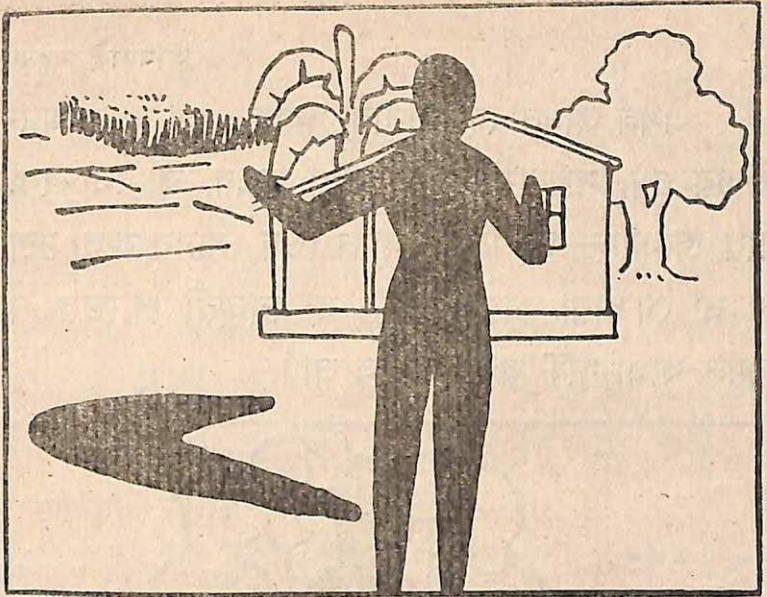
৭। সম্পত্তি আর জমি-জমা রাখার অধিকার।
৮। বেগার খাটানো, মানুষ নিয়ে কেনা-বেচা এইসব পাপ থেকে মুক্তি পাবার অধিকার।
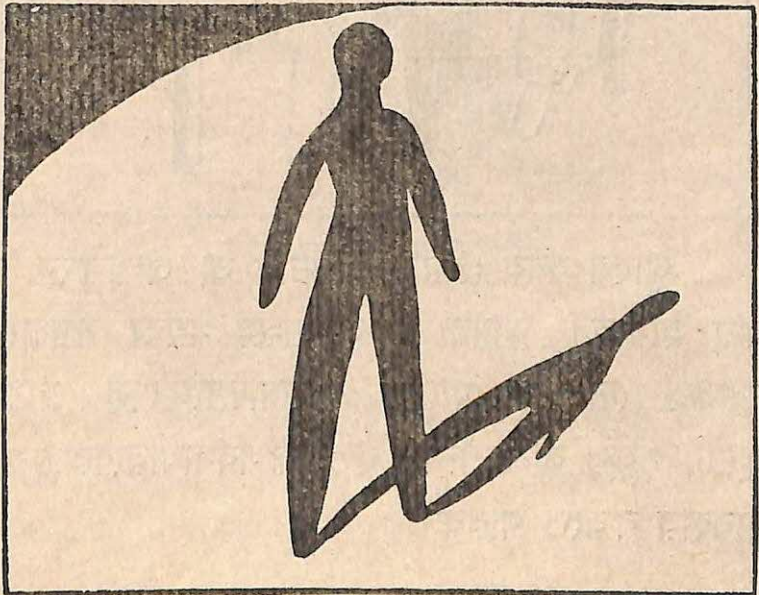
এখন আমরা দেশবাসীরা সকলে সমান। আমাদের ভিতর ধর্ম, সম্প্রদায়, জাতি আর লিংগ, বা কে কোন ঘরে জন্মেছে—তা নিয়ে কোন ভেদ বিচার করা চলবে না বা তা'দ্বারা তার উন্নতি বা চাকুরী লাভের পথে কোন বাধা সৃষ্টি করা চলবে না।
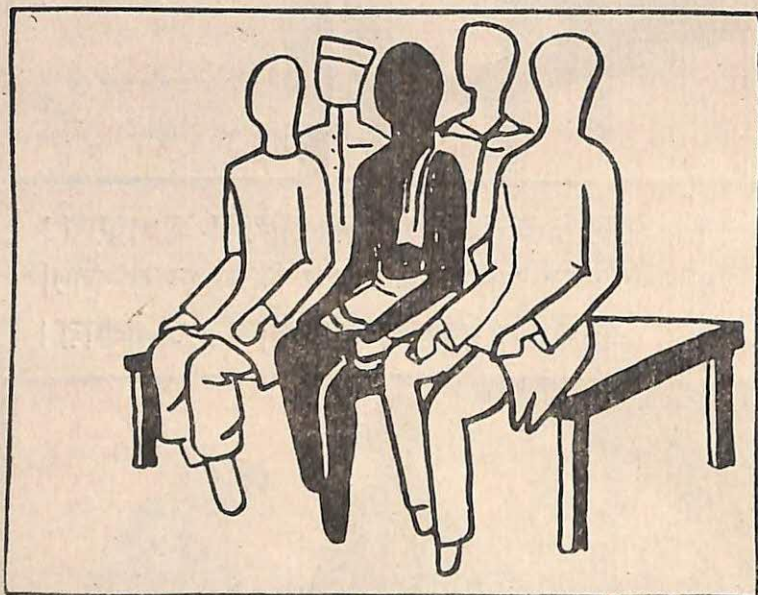
আইন করে ছোঁয়াছুঁই বিচার বা অস্পৃশ্যতা রদ করা হয়েছে। আমরা সকল মানুষ সকল সম্প্রদায়ের লোকই দোকান হোটেল, আমোদপ্রমোদের জায়গা, কুয়ো, পুকুর বা জলাশয়, ইত্যাদি সর্বসাধারণের জায়গা ব্যবহার করতে পারব।

এখন সবাকার বলতে, লিখতে, অর্থাৎ মত প্রকাশ করতে, সংঘ গড়তে, দেশের যে কোন জায়গায় বসবাস করতে, যে কোন ব্যবসা কাজ কারবার করার অধিকারী। কিন্তু এই স্বাধীনতার কোন অসদ্ ব্যবহার করতে পারব না। এই স্বাধীনতার সুযোগ থেকে দেশ আর সমাজের কোন বিপদ না ঘটে সে বিষয়ে সদা হুঁসিয়ার থাকা চাই।
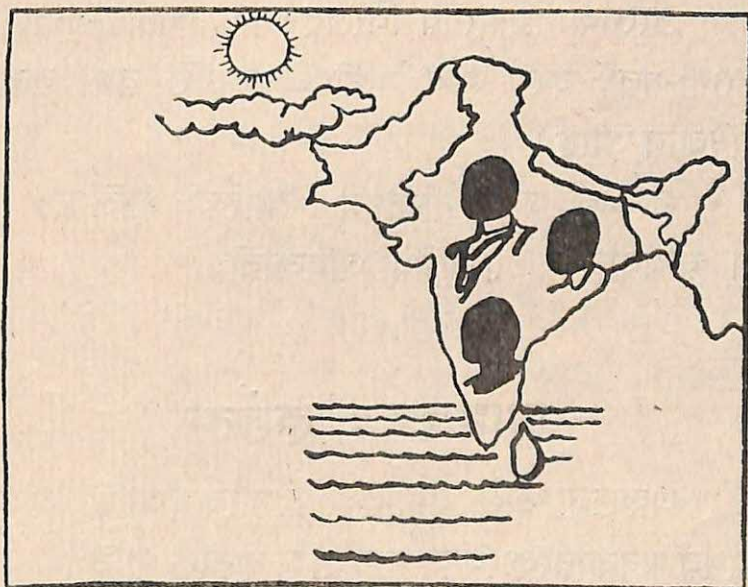
কোন ব্যক্তি স্ত্রী-পুরুষের কেনা বেচার ব্যবসা করতে পারে না। কোন লোককে জবরদস্তি খাটতে বাধ্য করতে পারে না। ছোট বালকদের কারখানা,

খনি আর চোট লাগার ভয় আছে এমন বিপজ্জনক কাজে লাগানো চলবে না। কাউকে খেয়াল খুশি মত জেলে আটকে রাখা চলবে না।

প্রত্যেকে আপন ইচ্ছা অনুসারে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করতে পারবে। কিন্তু তার ফলে দেশের শান্তি আর নীতি রক্ষায় কোন বিঘ্ন বা কু-প্রভাব না পড়ে।

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজের ভাষা, আচার-ব্যবহার, খাওয়া-পরা, কলা আর সংগীত, সংস্কৃতি রক্ষা করার অধিকার আছে।

প্রত্যেক মানুষ আপন সম্পত্তির মালিক। সে তা রাখবার বা বেচবার অধিকারী।

আমাদের কর্তব্য

একজন ভাল নাগরিক হিসাবে আমি আমার দেশের সরকারকে কিরূপে সাহায্য করতে পারি ?

১। আমি আমার ছেলেমেয়েদের স্কুলে পড়তে পাঠাব। পড়া লেখা শিখে সে সরকারের কাজকর্ম বুঝতে পারবে।

২। যারা লেখা পড়া জানে না, আমার থেকে তারাও লেখা পড়া শিখে নিক।

৩। আমি আমার দেয় কর যথা সময়ে চুকিয়ে দেব।

৪। আমার প্রতিনিধিকে আমি ভাল করে যাচাই করে দেখব। যিনি সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত, সবচেয়ে বেশী সৎ, যিনি জনতার ভাল চান, সর্বদা সেবা করে থাকেন, যিনি সাধারণ মানুষের কি দরকার তা ভাল বোঝেন, যিনি সেগুলি মেটাবার সবচেয়ে ভাল উপায় কি তাও জানেন—তাঁকেই আমি নির্বাচন করব।

৫। আমি প্রত্যেক নির্বাচনে আমার ভোট দেব।

৬। আমি নিজে প্রতিনিধি হিসাবে খাড়া হব আর নিজে সমাজের কল্যাণ করবার দায়িত্ব নেব।

৭। আমি এই বিষয় হুঁসিয়ার থাকব যে গ্রাম-পনচায়েত থেকে সংসদ অবধি যাঁকেই আমি আমার তরফ থেকে পাঠাব, তিনি যেন জনসেবক হন। যদি তিনি আপন কর্তব্য পালন করতে চেষ্টা না করেন তা হলে আমি আগামী নির্বাচনে তাঁকে আর পাঠাব না।

৮। আমি দেশের সব আইন-কানুন মেনে চলব।

রাষ্ট্রীয় পতাকা

প্রত্যেক দেশের একটি রাষ্ট্রীয় পতাকা থাকে। আগেকার দিনে প্রত্যেক রাজামহারাজাদিগের আপন আপন পতাকা ছিল। মহাভারতের যুগে যে সকল রাজা-মহারাজারা ছিলেন তাঁদের সেনাদলের নিজের নিজের পতাকা থাকত। সাধু-সন্তরাও তাঁদের আপন আপন আখড়ায় আপন আপন পতাকা রাখতেন। অবশ্য এইসব পতাকা কেবল এক একটি দল বা সম্প্রদায়েরই হত।

রাষ্ট্রীয় পতাকা সারা দেশের পুরো রাষ্ট্রের পতাকা। তার মান-মর্যাদর ভার সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের ওপর থাকে। আমাদের রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় পতাকা তেরঙ্গা। এর মাঝখানে রয়েছে একটি চক্র। এই চক্রের মধ্যে চব্বিশটি আঁজি আছে। এই পতাকার রূপ আর রং কেন এইমত তা নিচে বলা হচ্ছে।

১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ সালের আগে অবধি আমাদের দেশে বিদেশীরা রাজত্ব করত। আমাদের দেশে তাদেরই পতাকা উড়ত। কংগ্রেস বিদেশী শাসনকে হটাতে চেয়ে তার মোকাবিলা করেন। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে তখন বিদেশীদের সংগে আপোষ করার মনোভাব

বেশী ছিল। সেই জন্য তারা নিজেদের যে পতাকা তৈরী করে তাতে হলুদ, সাদা আর সবুজ, এই তিন রঙের ভাগ থাকে। মাঝখানে 'বন্দেমাতরম' এই লেখাছিল। নীচে সবুজ পাড়ের এক কিনারায় সূর্য আঁকা ছিল। অন্য কোণায় চাঁদ আঁকা ছিল।

কিন্তু কংগ্রেসের অন্য দলগুলি এই পতাকাকে মানতে রাজি হন না। ১৯০৬ সালে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের সংগে মিলে-ঝুলে কাজ করা ঠিক করেন। এই মিল-ঝুল আপোষের ভাবটির প্রভাব পতাকার মধ্যে ফুটে ওঠে। তাই নতুন পতাকা লাল, সাদা, আর সবুজ এই তিন রঙে ভাগ করে তৈরী করা ঠিক হয়। লাল পটির বাঁদিকে বৃটিশ রাজের ইউনিয়ন জ্যাক ছাপ দেওয়া হয়। এই পতাকা ১৯২১ সাল পর্যন্ত রাখা হয়েছিল।

এই সময় কংগ্রেসে গরম দলের অর্থাৎ উগ্রপন্থীদের জোর বেড়ে যায়। ১৯২১ সালে কংগ্রেসের বিজয়ওয়াদা অধিবেশনে গান্ধিজী হাজির ছিলেন। তিনি পতাকায় রাষ্ট্রীয় রং চড়ান। তখন লাল পটির জায়গায় আবার হলুদ পটি করা হল। মাঝখানে চরকা আঁকা হয়। করাচীর কংগ্রেস অধিবেশনে আবার এর একটু

হেরফের করা হলেও রং আর চিহ্ন আগে যা ছিল তাই থাকে।

দেশ স্বাধীন হলে পর রাষ্ট্রীয় পতাকার রূপের বিষয়টি আবার ওঠে। স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেসের পতাকা ছিল সকলের আগে। কংগ্রেস তখন একটি মাত্র দল ছিল। পুরো রাষ্ট্রের কথা বিবেচনা করে পতাকায় আবার কিছু মামুলী অদল-বদল করা হল। রং আগে যা ছিল তাই রইল, কিন্তু মাঝখানে চরকার জায়গায় চক্র রাখা হল। এই চক্র সারনাথে অশোক স্তম্ভের ধর্ম-চক্র থেকে নেওয়া। এই চক্রের মানে হল —জয় প্রকাশ দাতা আর শান্তি দাতা। এই পতাকার বিষয় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বিধান সভায় বলেছিলেন একে দেখে আমাদের সাহস বাড়বে। আমাদের শিরায় শিরায় উৎসাহের স্রোত বইবে। এগিয়ে চলবে বল মিলবে। আমাদের জাহাজ এই পতাকা উড়িয়ে বিদেশের বন্দরে যাবে। অন্য দেশের মানুষদের কাছে তা এই বাণী বয়ে নিয়ে যাবে যে আমরা সকল দেশের জনসাধারণের সংগে বন্ধুত্ব কামনা করি। আমরা সকলকে স্বাধীন দেখতে চাই।

ডাক্তার রাধাকৃষ্ণান বলেছিলেন—এই পতাকার গৈরিক রং সাহস আর ন্যায়ের ভাব প্রকাশ করে। সাদা রং শান্তির সুচক। সবুজ রং শ্রদ্ধা আর শক্তির ভাব প্রকাশ করে। আর মাঝখানের চক্র সময়ের সাথে পা ফেলে চলার সংকেত করে। সদা সর্বদা ন্যায়ের পথে থাকবার বাণী এই পতাকা জানায়।

রাষ্ট্রীয় পতাকার মর্যাদা

আপন রাষ্ট্রীয় পতাকা আপন রাষ্ট্রের মান মর্যাদার নিশান। পতাকার সম্মান রাষ্ট্রের সম্মান আর পতাকার অপমান রাষ্ট্রের অপমান। এইজন্য এই পতাকাকে পুরো সম্মান দান করুন।

কোথায় এই পতাকা উড়বে ?

রাষ্ট্রীয় পতাকা খেয়ালমত যেখানে সেখানে তুলবেন না। এই পতাকা কেবল সরকারী ভবনগুলিতেই শোভা পাবে। যে সকল বাড়ির ওপর রাষ্ট্রীয় পতাকা তোলা যেতে পারে, সেগুলি হল ঃ

উচ্চ আদালত, সচিবালয় বা সেক্রেটারিয়েট, আয়ুক্ত কার্যালয়, জেলা শাসকের বিচারালয়, জেলার

জেলখানা, জেলা পরিষদ, নগর সভা, পনচায়েত গৃহ।

দেশের ভূতপূর্ব রাজন্যবর্গ, ভারতীয় রাজদূত, ভারত সরকার আর রাজ্য সভার মন্ত্রী, রাজ্য সভার অধ্যক্ষ, লোকসভার অধ্যক্ষ, রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ, রাজ্য বিধান পরিষদের অধ্যক্ষ, মুখ্য আয়ুক্ত, আয়ুক্ত আর উপ-আয়ুক্ত আর জেলাশাসকের স্থায়ী আবাসের বাড়িগুলিতে এই পতাকা ওড়ে।

মন্ত্রীদের মোটর গাড়িতে রাষ্ট্রীয় পতাকা লাগান থাকে। দেশীয় রাজ্যগুলির ভূতপূর্ব রাজা, ভারতীয় রাজদূত, রাজ্যসভার অধ্যক্ষ, লোকসভার অধ্যক্ষ, বিধান সভার অধ্যক্ষ, আর বিধান পরিষদের অধ্যক্ষও রাষ্ট্রীয় পতাকা আপনাদের মোটর গাড়িতে লাগাতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি আর রাজ্যপালদের নিজ নিজ পতাকা আছে। তাঁরা তাঁদের বাড়ি আর মোটর গাড়িতে সেই পতাকা ওড়াতে পারেন।

জাতীয় দিবস

রাষ্ট্রীয় পতাকা রাষ্ট্রীয় উৎসবে ওড়ান হয়ে থাকে। ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস, ২৬শে জানুয়ারী গণতন্ত্র দিবস, ২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্ম দিবস এই

দিনগুলিতে পতাকা তোলার দিন। এই দিনগুলি ছাড়া অন্য দিনে আমাদের রাষ্ট্রীয় পতাকা তোলা নিষেধ।

পতাকা তোলার কায়দা

রাষ্ট্রীয় পতাকা কেবল দিনের বেলায়ই ওড়াবেন। সূর্য ডোবার সংগে সংগে তা নামিয়ে নেবেন। পতাকা এমনভাবে তুলবেন যেন তার হলুদ রঙের ভাগ সর্বদা ওপর দিকে থাকে। আর সবুজ রং নীচে থাকে।

পতাকা তুলবার সময় খুব তেজে তুলবেন, আর পোলের মাথা পর্যন্ত তা পৌঁছায়।

যদি মঞ্চের উপর পতাকা লাগাতে চান ত যিনি ভাষণ দেবেন তাঁর ডান দিকে যেন তা থাকে।

পতাকার উপর বা ডান দিকে আর কোন পতাকা বা নিশান রাখবেন না।

যদি আপনি পতাকা কোন মিছিলে নিয়ে চলেন তা হলে তা সব থেকে আগে নিয়ে চলবেন।

পতাকা ডান কাঁধে বহন করবেন, একেবারে খাড়া করে ধরবেন। আড়াআড়ি বা তেরছা করে নিয়ে যাবেন না।

পতাকা অভিবাদন

যেখানে পতাকা তোলা হবে, সকল লোক সে দিকে মুখ করে সাবধানে খাড়া হোন। যাঁদের মাথায় টুপী বা পাগড়ি আছে তাঁরা ডান হাত মাথা অবধি তুলে পতাকা সালাম করুন। যাদের মাথায় কোন আবরণ নেই তাঁরা একটু পায়ের পাতার উপর উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে সালুট করুন। এর পরে রাষ্ট্রীয় সংগীত "জন-গণ-মন অধিনায়ক" সকলে একসাথে সুরের সংগে গাইবেন।

মনে রাখবেন

পতাকার মাপ খেয়াল মত করা উচিত নয়। যদি তা চওড়ায় দু' ফুট হয় তো লম্বায় তিন ফুট হবে। এই লম্বা আর চওড়ার অনুপাতে বড় ছোট মাপের পতাকা করা চলে।

পতাকা কখনো মেঝে বা ফরাশ যেন না ছোঁয়।

পতাকার চক্রের জায়গায় অপর কোন নিশানা থাকবে না।

পতাকাকে কখনো কাপড়ের মত ব্যবহার করবেন না।

পতাকাকে কখনো চাঁদোয়ার মত টানাবেন না।

পতাকা নোংরা বা খারাপ হতে দেবেন না।

রাষ্ট্রীয় সংগীত

রাষ্ট্রের একতার অপর চিহ্ন হল রাষ্ট্রীয় সংগীত। যেমন কংগ্রেসের স্বরাজের লড়াইতে তেরঙা পতাকা বল জুগিয়েছে, তেমনি "বন্দে মাতরম" আর "জনগণ-মন অধিনায়ক" গান দুটিও বল দিয়েছে।

"বন্দে মাতরম" বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত গান। "জন-গণ-মন-অধিনায়ক" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত গান। ১৯১১ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের প্রথম দিনের কাজ "বন্দে মাতরম" দিয়ে শুরু হয়। দ্বিতীয় দিনের কাজ "জন-গণ-মন অধিনায়ক" দিয়ে শুরু হয়। তখন থেকে কংগ্রেসে এই দুই গানের খুব সম্মান হয়ে আসছে। যখন নেতাজী সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়েছিলেন তিনি "জন-গণ-মন"-কে আজাদ হিন্দ ফৌজের গান নির্বাচন করেন। যে সব বিদেশীরা এই গান শোনে তারাও এই গানের সুর আর ঢং খুব পছন্দ করেছিল।

১৯৪৭ সালে সংযুক্ত রাষ্ট্র সংঘের প্রধানেরা ভারতের প্রতিনিধির কাছে ভারতের রাষ্ট্রীয় সংগীত জানাতে বলেন। সেই সময় রাষ্ট্রীয় সংগীতের বিষয়ে পুরোপুরী ফয়শলা হয়নি। তাদের কাছে কেবল

"জন-গণ-মন অধিনায়ক" গান থানির একটি রেকর্ড ছিল, তাঁরা সেইটিই দিয়ে দিলেন। যথন সেই গানথানি বাজান হ'ল তথন অনেক দেশের প্রতিনিধিরা সেটি থুব পছন্দ করেন। তাঁরা এই গানের তাল, স্থুর জানতে চান। এর পর থেকে এই গান ভারতীয় ফৌজ আর ভারতীয় দূতাবাসগুলিতে চালু হয়ে যায়।

বিধান সভার কিছু সদস্য "বন্দে মাতরম"-কে রাষ্ট্রীয় সংগীত হিসাবে গ্রহণের দাবী করেন। শেষে 'জন-গণ-মন' আর 'বন্দে মাতরম' এই উভয়ের কিছু হেরফেরের পর রাষ্ট্রীয় সংগীত হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

"জন-গণ-মন অধিনায়ক"

জন-গণ-মন অধিনায়ক জয় হে, ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।
পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা, দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ
বিন্ধ্য-হিমাচল-যমুনা-গংগা, উচ্ছল-জলধি-তরংগ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে
গাহে তব জয় গাথা।
জন-গণ, মংগল দায়ক জয় হে, ভারত ভাগ্য বিধাতা॥
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে॥

(জন-গণের মনের প্রভু, হে ভারতের ভাগ্য বিধাতা, তোমার জয় হোক। তোমার শুভ নামে পাঞ্জাব,

সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা, দ্রাবিড়, উৎকল এবং বাংলা জেগে ওঠে। তোমার নামে বিন্ধ্যাচল, আর হিমালয়ের পর্বতমালা, সাগরের উঁচু ঢেউ জেগে ওঠে, গংগা আর যমুনার স্রোত তোমার নামে বয়। তোমার আশীর্বাদ সকলে প্রার্থনা করে। তোমার জয়গান করে। জন-গণের কল্যাণ সাধক, হে ভারতের ভাগ্য বিধাতা, তোমার জয় হোক, জয় হোক, জয় হোক!)

"বন্দে মাতরম"

সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং, শস্য শ্যামলাং মাতরম্!
শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীং
ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীং,
সুহাসিনীং, সুমধুর ভাসিনী, সুখদাং বরদাং মাতরম্!
বন্দে মাতরম্ !!

(অই মা, আমি তোমায় প্রণাম করি। তুমি সুজলা, সুফলা, শস্যে শ্যামল করে রাখ আমাদের ক্ষেতগুলি। শুভ্র মিঠে হাওয়ায় প্রাণ জুড়াও। তুমি জোছনার আলোয় রাতকে আনন্দে ভরিয়ে মাতিয়ে তোল, গাছে গাছে ফোটা ফুলের শোভায় পরিপূর্ণ কর, তুমি সুন্দর হাস্যময়ী, সুমধুর ভাষাময়ী। তুমি সুখ দাও, বর দাও, হে জননী! তোমায় প্রণাম করি মাগো !!)

রাষ্ট্রীয় সংগীতের সম্মান

রাষ্ট্রীয় সংগীত আমাদের রাষ্ট্রের আত্মার জবাব। এই সংগীতের মান মর্যাদা আমার স্মরণ রাখা কর্তব্য।

এই গান আপন ইচ্ছা মত গাওয়া উচিত নয়। এর সুর ভাল করে শিখে নিন।

সকলে মিলে এই গান গাইবেন। এমন যেন না হয় যে কিছু লোক গান করে অপরেরা শুধু শোনে।

যখন রাষ্ট্রীয় সংগীত গাওয়া হয় তখন শ্রদ্ধার সংগে উঠে দাঁড়াবেন।

যখন রাষ্ট্রীয় সংগীত শোনা যাবে, তখন আপনি যেখানেই থাকুন, যে কাজেই ব্যস্ত থাকুন, তখনই খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে শুনবেন।

মোহর

প্রত্যেক সরকারের নিজস্ব মোহর থাকে। যে কাগজে এই মোহরের ছাপ থাকে তা বিশ্বাসের যোগ্য মানা যেতে পারে। আমাদের সরকারেরও নিজস্ব মোহর আছে। এটি অশোক স্তম্ভের উপরে যে মূর্তি বসানো ছিল তারই মত।

অশোক স্তম্ভের উপরের মূর্তি সারনাথের জাদুঘরে রাখা আছে। এটি সাত ফুট উঁচু। এতে চারটি বসে থাকা সিংহের মূর্তি আছে। চারটি সিংহের পিঠ একে অপরের সংগে আঁটা। চারটি সিংহের মুখ চার দিকে চেয়ে আছে। এই প্রকারে একটি পূর্বে, দ্বিতীয়টি পশ্চিমে, তৃতীয়টি উত্তরে আর চতুর্থটি দক্ষিণ দিকে চেয়ে দেখছে। পুরো সিংহ-কলসটি অত্যন্ত চকমকে দেখতে। বেশ

আলোয় যদি কেউ এর কাছে দাঁড়ায় ত তার ছায়া ফুটে উঠবে এর গায়। এমন শিল্পকাজ দুনিয়ায় খুব কমই আছে। কিন্তু এর দাম তা থেকেও অনেক বেশী। সিংহ খুব শক্তিমান জীব। সে সর্বদা সজাগ থাকে। চারটি প্রহরী সিংহ চিরদিন সাম্য, একতা, সজাগতা আর শক্তি জাহির করে। তারা এক বেদীর ওপর বসে আছে। এই বেদীর গায় চক্র খোদাই করা। আমরা জানি এই চক্র জ্ঞান আর শান্তিদাতা। এইভাবে আমরা দেখি কি চারটি সিংহ জ্ঞান আর শান্তির পক্ষে। আমাদের মোহর আমাদের এই শিক্ষা দেয় কি আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব, একতা, সজাগতা, আর শক্তি আছে। আমরা সর্বদা ন্যায় আর শান্তির পক্ষে।

আমাদের জীবন মন্ত্র

দিল্লীতে লোক-সভার ঘরে অধ্যক্ষের আসনের পিছনে দুটি শব্দ বিজলীর আলোয় চমকায়। ওই শব্দ 'মণ্ডুক' উপনিষদ থেকে নেওয়া। ওই শব্দ গান্ধীজীরও জীবন-মন্ত্র ছিল। এ আমাদেরও জীবন-মন্ত্র। এই শব্দ হল

সত্যমেব জয়তে

সত্যেরই বিজয় হয়।